করিলেন, এইরূপে এবং শিবস্বস্ত্যয়ন ও পঞ্চ দেবতার পূজা দিয়া তিনি ছেলের কলিকাতা-যাত্রার ব্যবস্থা ব্যর্থ করিবেন। অতএব সাহেবের তাঁবু উঠিতে না উঠিতে অন্দরে বাহিরে ধূম পড়িয়া গেল। এ সকল খরচপত্র কর্ত্রীর নিজ "জায়গীরে"র তহবিল হইতে সরবরাহ হইত, কাজেই উপরিওয়ালাদের মঞ্জুরির লাঞ্ছনার ভয় ছিল না।

মিষ্টান্ন এবং পূজায় মর্ত্ত্যের এবং স্বর্গের দেবতাদের তুষ্টি সাধন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যারা দিন আনে দিন খায় তাদের চাকরী তাহাতে বজায় থাকা সচরাচর সংশয়স্থল। মাষ্টার মহাশয় এবং পণ্ডিত মহাশয় অতঃপর কাজে কাজেই আপনাদের বিদ্যার বোঝা নবছরের নাবালকটীর উপর চাপাইতে লাগিলেন। শীতকালের প্রভাতে নবীন সূর্য্যের হিরণ-কিরণহিল্লোলে যখন হরিপ্রিয়ার সোণার গোপাল দুলিতে থাকে এবং সদাবৃত বুলবুলিগুলির লড়াই সুরু হইয়াছে মাত্র, তখন কিনা চল্লিশ টাকার বিধু মাষ্টার ফার্ষ্ট বুকের পাতা খুলিয়া তার উপর চোক গরম করে! দুপুর বেলায় সোণার যাদু গ্রহবাজ কবুতরগুলিকে উড়াইয়া দিয়া যখন একমনে ছাদে দাঁড়াইয়া নীল আকাশে তাহাদের "উল্‌টা বাজি" দেখিতে দেখিতে উল্লাসে করতালি দিতেছে, কোথা হইতে হরিশ পণ্ডিত আসিয়া তখন জুড়িয়া বসিল এবং "কোকার" সকলের সেরা কবুতর জোড়াটী সেই অবসরে বাজপক্ষীর নখবিদ্ধ হইয়া দীঘির জলে পড়িয়া গেল। এ সকল "জুলুম" ক্রমে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিষ্ণুতা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কলেক্টর সাহেবের ভয়ে প্রথম প্রথম তিনি কিছু বলিতে পারিতেন না। রোজ "কোকন" মাষ্টার পণ্ডিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াই মার কাছে তাঁহাদের শাস-

নের ঝাঁটাঝাঁটির নানা নালিশ রুজু করে এবং কোন প্রতীকার হয় না দেখিয়া বিস্তর জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিশোধ লয়। কর্ত্রী কেবল কাঁদেন আর শিক্ষকদ্বয়কে মিষ্টান্ন এবং বস্ত্রাদি উপহার দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। দীনেন্দ্র অনেকগুলি নূতন রকমের খেলা এবং দুষ্টুমিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও মাষ্টার পণ্ডিতের চাকরী বজায় রাখিবার দিকে আদৌ মনঃসংযোগ করে নাই। অতএব বছরের শেষাশেষি দুজনেই হরিপ্রিয়াদুলালের কর্ণ এবং গণ্ড প্রায় ইজারামহল করিয়া তুলিলেন। হরা খানসামা একদিন মুখভার করিয়া কর্ত্রীকে জানাইল "কত্তা, কত দুক্ষের কোকন, দুদিকে দুটো মাষ্টার পণ্ডিতে তাকে ছেঁড়াছিঁড়ি করে, রোজ রোজ ত চখে দেখা যায় না।" হরার সেদিন দুইটাকা মাহিনা বাড়িয়া গেল। দেখিয়া চাকরাণী বিনোদা তার দুদিন পরে কাঁদিয়া বলিল, "মা, বলি কোকনকে অত করে' মানুষ করেছিলাম, সে কি এই শাস্তির জন্যে? আমাকে দেখাবার জন্যেই যেন মাষ্টার পোড়ারমুখো বাছার গাল টিপে দিলে! আহা টুকটুকে গাল থেকে কত রক্তই বেরুল!"

এইরূপে কর্ত্রীর অপত্যস্নেহ ক্রমে সদ্যপ্রসূতা গাভীর মত অসংযত হইয়া উঠিল। কলেক্টর সাহেবের খাতির ভুলিয়া তিনি মাষ্টার পণ্ডিতকে ডাকাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তাঁর কোকনের গায়ে হাত তুলিলে তাঁহাদের ভাল হইবে না। তাঁর ছেলে কিছু দুঃখীর সন্তান নয়, যে, লেখাপড়া না শিখিলে তার সংসার চলিবে না।

কিন্তু কর্ত্রীর রাগ অভিমানের ভয় অপেক্ষা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের লালমুখখানার আতঙ্ক শিক্ষকযুগলের হৃদয় অধিকতর অধিকার

করিয়াছিল,—ক্রমে উভয়েই ইহার পর বেত ধরিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা বাসায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তনের সময় প্রায় প্রত্যহ দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের উপযুক্ত হাত নানা রঙের নানা ছাপে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার পর বাসায় ভূতেরও ভারি দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইল। তাহাতেও চাকরীর মায়া কাটে না দেখিয়া স্বয়ং অগ্নিদেব এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের শয়নগৃহের "চাল" আশ্রয় করিলেন। অনেক লোক আসিয়া পড়াতে ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ ছটো বাঁচিল বটে, কিন্তু "উপাধি" এবং দেহ ছাড়া আর সবই পুড়িয়া গেল। অতঃপর বলা বাহুল্য আপন আপন প্রাণ বাঁচাইয়া পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য উভয়েই গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় তরফের "কোকনের" পোয়াবারো—সারাদিনই ছুটী এবং সারাদিনই খেলা। বুলবুলি, শালিখ, কবুতরে কোকনের খেলিবার ঘর সকল ভরিয়া গেল এবং মাষ্টার পণ্ডিতের দগ্ধীভূত বাসার উপরে তাহার ছাগ ও "লড়াইয়ে" মেষের ঘর তৈয়ারি হইল।

মাষ্টার পণ্ডিতের হাত হইতে পুত্ররত্নকে উদ্ধার করিয়া হরিপ্রিয়া দেবী অতঃপর ঘন ঘন এবং অধিক জাঁকের সহিত শিবস্বস্ত্যয়ন এবং পঞ্চদেবতার পূজা দিতে লাগিলেন। রাগ অভিমানের বেগ সংযত হইয়া আসিলেই কলেক্টর সাহেবের বিভীষিকা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কর্ত্রী মনে ভাবিতেন তিনি যদি বড়মানুষের ঘরে না পড়িয়া গরিব গৃহস্থের বউ হই-

তেন, তা হলে নিজের ছেলের উপর তাঁহার দাবিদাওয়া থাকিত। এক একবার মনে হইত নিজের অলঙ্কারগুলি লইয়া নৌকা করিয়া সসন্তান এমন দেশে চলিয়া যাইবেন যেখানে তাঁর কোক-নের উপর কলেক্টর সাহেবের কোন জোর খাটিবে না। কিন্তু তার পরেই মনে হইত, নৌকায় উঠিলে তাঁর গা বমি বমি করে, নৌকাগুলো বড় টলে আর "কোকন" লাফাইয়া তার "ছইয়ে" উঠিতে যায়!

ক্রমে এমন হইল যে, কলেক্টর সাহেব দীনেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া যাইতে না পারেন এই উদ্দেশে কর্ত্রী তাহাকে আর বড় বাহিরে যাইতে দেন না। সেই মাষ্টার এবং পণ্ডিতকে অনেক দিন তিনি মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা এক দিন মনে হইল তাহাদের খোঁজ করিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া তাদের মুখবন্ধ করিবেন। নহিলে তারা যদি কলেক্টার সাহেবের কাছে "চুকলি" করে, তবে আর কোকনের কোন মতে নিস্তার নাই। অতএব জায়গীরের আমলা একজন টাকার তোড়া লইয়া মাষ্টার পণ্ডিতের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।

এদিকে বি, এ, মাষ্টার বিধুভূষণ বাবু বাড়ী যাইবার সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই বটে, কিন্তু বাড়ী গিয়া উত্তেজিত হৃদয় কতক শান্ত হইলে বিবেচনা করিলেন, পণ্ডি-তের দৌড় নর্ম্মালস্কুল পর্য্যন্ত বই নয়, কিন্তু তিনি একটা "গ্রাজু-য়েট্", যে-সে লোকের মত অপমান সহিয়া থাকা তাঁহার শোভা পায় না। অতএব তিনি চিঠিযোগে সবিশেষ বৃত্তান্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে জানাইলেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই প্রথম প্রথম জেলার ভার পাইয়াছেন, চারি-দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তাঁর এক্তিয়ারের ভিতর নেপাল বা তদ্রূপ

কোন দেশীয় রাজ্যসুলভ "জুলুম" হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধে তিনি দিশাহারা হইলেন। ম্যানেজারকে ডাকিয়া বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং আদেশ দিলেন "কেনকোর" নাবালককে সদরে আনিতে হইবে।

সে সহজ কথা নহে। ম্যানেজার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনিতেন। বুঝিলেন কিছু কল কৌশল না করিয়া সহসা এই হুকুম তামিল করিতে গেলে তিনি একটা খুনোখুনির হাঙ্গামায় পড়িবেন। কিন্তু সাহেব তাহা বুঝিলেন না। ম্যানেজারের রিপোর্ট পাইয়া তাঁহার সন্দেহ রহিল না, হয় হরিপ্রিয়া অর্থবলে তাহাকে বশ করিয়াছে, নয় সে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য এবং ভীরু। শেষে সাহেবের আদেশে পুলিস-ইনস্পেক্টর সিপাহী-শান্ত্রী-ঘেরা পাল্কীতে দীনেন্দ্রনাথকে সদরে হাজির করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষে যদি সত্য সত্যই কলেক্টর সাহেব তাঁহার কোকনকে ধরিয়া লইয়া যায়, নিজে তিনি আত্মহত্যা করিয়া এ জীবনজ্বালা জুড়াইবেন। নহিলে কিসের জন্য প্রাণ? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে মরাটা যত সহজ মনে করে, আসলে মৃত্যু কিছু ততটা সহজ নহে। স্বামীর অন্তিম ক্ষণে শোকের অধীরতায় একবার তাহাই ভাবিয়া তিনি হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর সকল ফুরাইয়া গেলে মধুর কণ্ঠে ছেলে যখন মা বলিয়া ডাকিল এবং কচি কচি হাত দুখানি দিয়া চারি বছরের যে অঞ্চলের নিধি তাঁহার চোকের জল মুছাইয়া আধ আধ কথায় বলিল—"ছি কেঁদো না" তখন

তাহার মুখ চাহিয়া আবার তাঁর বাঁচিতে সাধ হইয়াছিল। পুলিশের কৌশলে ঘটনার দিন বহির্বাটীতে ভালুকনাচ সুরু হইলে দীনেন্দ্রকে বাহিরে পাঠাইয়া স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী চীনের ঘরের খড়খড়ি ঈষৎ মুক্ত করিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ নীলপোসাক-আঁটা শ্মশ্রু-গুম্ফে-পরিপূর্ণ পুলিসের বড় দারোগা মহাশয় ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে আসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাহকস্কন্ধে একখানা পালকী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একটা গোলমাল হইয়া উঠিতে না উঠিতে রোরুদ্যমান নাবালককে তাহাতে পূরিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছদ্মবেশী কনষ্টেবলের দলকে সটান যাত্রার আদেশ দিলেন। চকিতে পাল্‌কী দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। পরিচারিকারা গিয়া দেখিল, পাষাণমূর্ত্তিবৎ কর্ত্রী সেই পাল্‌কীর পথ চাহিয়া আছেন! তখন তাঁহার মনে হইতেছিল, সেই চীনের জানালা গলিয়া লাফাইয়া পড়িলে এ অপমান এবং ক্লেশের অবসান হইতে পারে, কিন্তু পাল্‌কী হইতে কোকনের যে উচ্চ রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে এবং মর্ম্মে পশিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নড়িবার যো ছিল না।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে আসিয়া কর্ত্রী ঠিক্ করিলেন, তিনিও ছেলের সঙ্গে সঙ্গে কলেক্টর সাহেবের কাছে যাইবেন এবং দুঃখিনীর মত কোকনকে ভিক্ষা করিয়া লইবেন, বলিবেন, যে, বিষয় আশয় তিনি কিছু চান না, কিন্তু তাঁর বুকচেরা ধন ছাড়িয়া তিনি বাঁচিতে পারিবেন না। প্রতিবেশী এবং আমলারা মেয়েলী বুদ্ধি বলিয়া ত পরামর্শটা উড়াইয়া দিলেন এবং সকলে যুক্তি করিয়া টাকার তোড়া সঙ্গে পালকীর উদ্দেশে ঘোড়সওয়ার রওনা করিলেন। তাহাতে পুলিশচরিতজ্ঞ লোকমাত্রেরই ভরসা

হইয়াছিল বটে যে, নাগাইদ সন্ধ্যা দারোগা সাহেব সপাল্‌কী ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোড়সওয়ার রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া এত্তালা করিল যে, টাকা পাইয়া দারোগা সাহেব ভারি খুসী হইয়াছেন এবং কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে "বহুৎ বহুৎ সেলাম" দিয়া বলিয়াছেন যে, কোন "পরওয়া" নেই, তাঁহার পুত্রকে পরম যত্নে তিনি সাহেব বাহাদুরের হুজুরে পৌছিয়া দিবেন। আর কর্ত্তার অনেক খোসনাম করিয়া রিপোর্ট করিবেন যে, নাবালককে বিনা ওজরে তিনি হাজিরি দিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন ইত্যাদি।

হরিপ্রিয়া মরিতে পারিলেন না। "মিতিন" প্রভৃতি বয়স্যার দল তাঁহাকে সহজেই বুঝাইয়া দিল যে, বিষয় যখন "কোরটে" গিয়াছে, তখন দুদিন আগে হোক্ কি পাছে হোক্, কোকনকে কাছছাড়া করিতেই হইত। এখন মিছামিছি কাঁদাকাটা করিয়া "ছাওয়ালের" অকল্যাণ করাটা ভাল নয়, বরং তার বিবাহ দিয়া বউমাকে ঘরে আনিয়া সংসার বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। অতএব সেই আশায় উৎসাহে কর্ত্রীঠাকুরাণী আবার স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে মন দিলেন। মরা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে হরিপ্রিয়া দেবী স্বর্গারোহণ করিতে পারিলে তাঁহার কোকনের ভাল হইত, একথা অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে। ইহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কলেকটর ষ্টুয়ার্ট সাহেব দীনেন্দ্রনাথের লেখাপড়া এবং ক্রীড়াকৌতুকের বিশিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বোর্ডে রিপোর্ট পাঠাইলেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে মাতা বিস্তর টাকা খরচ করিয়া কলেকটরের

নিয়োজিত লোকজনকে বশ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ফলে কোকনের বাল্যসখারা প্রায় প্রত্যহ কুন্তলা হইতে সদরে আনাগোনা সুরু করিল। দীনেন্দ্রের পরমপ্রিয় পাখী এবং ছাগমেষপালও ক্রমে আসিয়া জুটিল। টাকার জোরে এ সকলের কিছুই ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কানে উঠিত না। বাসায় গিয়া "ওয়ার্ড"কে দেখিয়া আসা কোন আইনে কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করে না, সুতরাং নাবালক মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসাতেই কলেক্টর বুঝিতে পারিতেন যে, ক্রমে সে বেশ শায়েস্তা হইতেছে। বিশেষতঃ অশ্ববিদ্যাপারদর্শী ষ্টুয়ার্ট সাহেবের আদেশমত ম্যানেজার নাবালকের জন্য ঘোড়া কিনিয়া দেওয়ায় এবং তাহাকে দুএকদিন তাহাতে চড়িতে দেখায়, কলেক্টর নিজের হুকুম তামিলের আত্মপ্রসাদটুকু উপভোগ করিতে করিতে বদলী হইলেন। তার পর ও পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে দুই জন কলেক্টর আসিলেন এবং গেলেন। কাজেই দীনেন্দ্রনাথের উপর যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ষ্টুয়ার্টের ছিল, তাহার তীব্রতা এবং বাঁধাবাধি কমিয়া আসিল। ইংরেজ রাজ্যে যতগুলি অসম্পূর্ণতা আছে, এই দুর্ব্বোধ্য "পবলিক সার্ব্বিসের" প্রয়োজনবশতঃ যখন তখন আফিসার বদলের রেওয়াজ তার অন্যতর। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পর বছরে গড়ে দুটো করিয়া কলেকটর বদলী হওয়ায় দীনেন্দ্রের অধঃপাতের পথটা বেশ সুগম হইয়া উঠিল। শেষে সদাশিব শ্রীমান্ গোবিন সাহেব আসিলেন, দীনেন্দ্র তখন সহরবাসী বড়মানুষের ছেলেসুলভ বিস্তর চালাকি শিখিয়া ফেলিয়াছে, অতএব সাহেবটীকে সিধা লোক পাইয়া নানা অছিলায় তাহার মাতৃদর্শন ঘটিত এবং দুদিনের ছুটীতে মোটে দুই সপ্তাহ বাড়ীতে কাটাইয়া গেলেও কোন কথা উঠিত না। এইরূপে নাবালক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া পঞ্চদশে

পা দিল। মাতা তখন অনেক তদ্বির করাইয়া বোর্ড হইতে ছেলের বিবাহের মঞ্জুরি আনাইলেন। যথাকালে খুব ধূমধামে দীনেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

এই সময়ে কলিকাতার স্বনামখ্যাত ওয়ার্ড-ইনষ্টিটিউটের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরলোকের পথে যাইতে বুড়ারা যেমন সকল তীর্থ শেষ করিয়া ৺কাশীধাম সার করেন, তখনকার দিনে তেমনি বড়মানুষের ছেলেরা এইখানে আসিয়া জুটিতেন। এই ওয়ার্ড-ইনষ্টিটিউট নাবালকির নিশীথে বিস্তর রাজাজমীদারকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জ্ঞানের এবং যৌবনের প্রভাতে তাহা-দিগকে দেশের নানাদিকে ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা দিক্ দেখাইয়া দিয়াছে। বিবাহশেষে দীনেন্দ্রকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল।

জেলার সদরে থাকিয়া দীনেন্দ্রনাথ কয় বছরে মোটামুটি ইংরেজী বলিতে কহিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, চুরট এবং সোডালেম-নেড্ খাইতে শিখিয়াছিলেন। কোর্টঅবওয়ার্ডস্ তাঁহার নিজের খরচপত্রের মাত্রা বাঁধিয়া দিলেও মাতার "জায়গীরের" তহ-বিলের উপর কাহারও হাত ছিল না, অতএব হরিপ্রিয়াদুলাল কোমল বয়সেই বেশ "সাথরুচে" হইয়া উঠিলেন। হরিপ্রিয়া নিজের জপতপ আহ্নিক এবং তাঁহার কোকনের চিন্তা লইয়া থাকিতেন, কখন সোডা লেমনেডের মর্ম্ম বুঝিতেন না। অতএব সে সবে অভ্যস্ত দীনেন্দ্র প্রথমবার বাটী গিয়া বোতল খুলিয়া সেই ম্লেচ্ছের জল মাতৃসমীপে পান করায় তাহার বড় নিন্দা হইল এবং কলেক্টর সাহেব তাঁহার অবোধ সন্তান ও তাহার পিতৃ-পুরুষের ইহকাল পরকাল নাশ করিতে বসায় শ্রীযুক্তা হরিপ্রিয়া দেবীর কাছে অনেক গালি খাইলেন। অতএব অতঃপর বেশী

টাকা কড়ির দরকার হইলে বাড়ী আসিয়া দীনেন্দ্রনাথ মাতাকে প্রথমতঃ সোডার বোতল খুলিয়া একবার রাগাইত এবং কাঁদাইত, তারপর নিতান্ত ভালছেলেটীর মত সন্ধ্যা-আহ্নিকে মন দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া যাইত। প্রকৃতির আইনানুসারে এই সকল গুণ ক্রমে আরো বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মফঃস্বলের "বনলতা" কি করিয়া রাজধানীর "উদ্যানলতা" হইয়া যায়, পরে তাহা দেখা যাইবে।

রৌপ্যমুদ্রা।

ভারতবর্ষে আজকাল টাকা লইয়া বড় আন্দোলন চলিতেছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে ক্রয় বিক্রয় সমুদয় টাকা লইয়া হয় এবং এই টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত। কিন্তু বিলাতে যে মুদ্রা প্রচলিত তাহা স্বর্ণমুদ্রিত। এখন এই স্বর্ণ এবং রৌপ্য লইয়া মহা বিবাদ ঘটিয়াছে। এতদিন এই দুই মুদ্রা একপ্রকার সখ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। দশটাকায় এক পৌণ্ড অথবা সভারেণ পাওয়া যাইত এবং এক টাকা দুই শিলিংএর সমতুল্য ছিল। দুয়ের মূল্য স্থির থাকাতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা স্থিরতা ছিল এবং এদেশ হইতে টাকা পাঠান অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য পদে পদে ঘটে। নানা কারণে রৌপ্যের দর বাড়িয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। এখন দুই শিলিংএ এক টাকা হয় না এবং এক পাউণ্ডে দশ টাকা হয় না। টাকার দর এক শিলিং তিন পেন্স কিম্বা দুই পেন্স অর্থাৎ পূর্ব্বকার দরে দশ আনা এবং দশ আনার কম হইয়াছে। ইহাতে

বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যদি বিলাত হইতে দ্রব্য ক্রয় করি তাহা হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইবে, এবং বিলাতের লোকেরা যদি আমাদিগের কোন দ্রব্য ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য দিলেও চলিবে। ইহাতে বিলাতের যথেষ্ট লাভ, কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশটা অনেক প্রকারে লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, যদি আমি এখান হইতে এক টাকা মুল্যের বস্তু সেখানে প্রেরণ করি, বিলাতের লোকেরা তাহার জন্য দশ আনা পয়সা দিবে। ইহাতে আমি যেমন পূর্ব্বে এক টাকা পাইতেছিলাম এখনও তাহাই পাইব, কিন্তু বিলাতের লোকেরা দশ আনা দিয়া জিতিয়া যাইবে। ইংরাজেরা রুটি খায়, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য গমের প্রয়োজন। এই গম তাহারা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইতেছে। যদি আমরা বলি—"তোমরা এত অল্প দাম দিতেছ, তোমাদেরই লাভ", বিলাতের লোকেরা বলিতেছে—"তোমরা আরও অধিক গম পাঠাও, তাহা হইলে তোমাদিগেরও লাভ হইবে"।

সুতরাং ভারত হইতে আজকাল অসাধারণ পরিমাণে গমের রপ্তানি চলিতেছে। বিদেশীয়েরা একপ্রকার এদেশকে শুসিয়া খাইতেছে। অথচ ভারতের লোকদিগের যেমন অন্নকষ্ট তেমনি আছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের জন্য অনেক টাকা বিলাতে খরচ করিতে হয়। অনেক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীরা এখানকার কর্ম্ম ছাড়িয়া স্বদেশে পেন্‌সান ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগেরই জন্য টাকার দর কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার পর এখানে বিলাতী সৈন্য আছে। তাহাদিগকে পাঠাইবার, শিক্ষা দিবার ব্যয় বিলাতে স্বর্ণমূল্যে

দিতে হয়। আবার যুদ্ধের আয়োজন পদার্থ এবং গবর্ণমেন্টের ব্যবহারার্থ দ্রব্যসকল বিলাতেই ক্রয় করিতে হয়। আবার দেখ, ভারতবর্ষকে মধ্যে মধ্যে অনেক লক্ষ পাউণ্ড বিলাতে ঋণ করিতে হয়। তাহার সুদ পাউণ্ডেই দিতে হইতেছে। এই সকল একত্রিত করিলে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষ ১৭। ১৮ মিলিয়ান ষ্টার্লিং পাউণ্ড বিলাতকে বর্ষে বর্ষে দিতেছে। ইহাতেই ভাবিয়া দেখ যে, বিলাতকে পোষণ করিবার জন্য আমাদিগের কত রক্ত দিতে হয়। ইহার উপর আবার আর একটি কথা আছে। এদেশে যে সকল মহামহোপাধ্যায় সিভিলিয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাহাদিগের পুত্র-পরিবার প্রতিপালনার্থ বিলাতে টাকা পাঠাইতে হয়। টাকার দর কমিয়াছে বলিয়া তাহাদিগের ব্যয় বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের উপর দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং তাহাদিগের সকলকার একপ্রকার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার জন্য ভারতের আরও প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। নানা কারণে দেশ ডুবিতেছে। একদিকে সাহেব কর্ম্মচারীদিগের অসম্ভব বেতন, অন্য দিকে রুষদিগের ভয়ে দুর্গনির্ম্মাণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের ব্যয়, এবং আর এক দিকে ব্রহ্মদেশে শান্তি স্থাপনের ব্যয়। এত অধিক ব্যয় চারিদিকে হইতেছে যে,শীঘ্রই বা গবর্ণমেণ্টকে দেউলে পড়িতে হয়। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা টাকার দর এক শিলিং চারি পেন্স করিয়াছেন এবং ট্যাঁকশালে টাকা মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, দেশে টাকা কমিলে রৌপ্যের দর আর কমিবে না, অগত্যা বাড়িবে। যেমন একটি পদার্থ প্রচুর হইলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, কিন্তু কোন

উপায়ে যদি তাহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হয়। বাহিরের লোকেরা টাঁকশালে যে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া লইত গবর্ণমেন্ট এই ভাবিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হিত করিতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। রৌপ্য প্রচলন বন্ধ হইবে, না, কোথা হইতে দেশে আরও অধিক রৌপ্য আসিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এদেশের লোকেরা রৌপ্য এবং রৌপ্যের মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ভাল বাসে, তাহাই এখন বাজারে দেখা দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতেও রৌপ্যের আমদানি হইতেছে। সুতরাং টাকার দর এক শিলিং তিন পেন্স হইতে এক শিলিং দুই পেন্স ও ভগ্নাংশ হইয়াছে। লর্ড ল্যান্সডাউন এবং বাবার সাহেব অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া রৌপ্যের দর বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা না বাড়িয়া দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি খরচের অবশ্যম্ভাবী ফল কি হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। ফল কথা এই যে, যদি আর অল্প দিনের মধ্যে কোন সুবিধার পথ আবিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের পরিত্রাণার্থ আবার কোন একটি নূতন ট্যাক্স উদ্ভূত হইবে এবং তাহা হইলে আমাদিগের জীবনও এইবারে ভরাডুবি হইবে। সকলই ভগবানের ইচ্ছা, এবং সকলই গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা।

প্রেমের অভিষেক।

কি হবে শুনিয়া, সখি, বাহিরের কথা,
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত কিছু! লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার,
কোথা আমি যুঝে মরি একপার্শ্বে তার
এক কণা অন্ন লাগি! প্রাণপণ করি'
আপনার স্থানটুকু রেখেছি আঁকড়ি'
জনস্রোত হতে। সেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্রভার; কভু অনুগ্রহ
কভু অবহেলা সহিতেছি অহরহ;—
সেই শত-সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া—নাহি জানি
কোন্ ভাগ্যগুণে! অয়ি মহীয়সী রাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্! কেন
সখি, নত কর মুখ, কেন লজ্জা হেন
অকারণে? নহে ইহা মিথ্যা চাটু! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে,
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর? ক্ষুদ্র আমি
কর্ম্মচারী, বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী,

কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ নাহি মানে,—রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে সৌভাগ্যগরবে
অজস্র উড়ায়ে ধূলি,—মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে! মনে মনে বলি, প্রভু,
যাও ছুটে যাও, খেল গিয়ে খেলাঘরে,
কর নৃত্য দীপালোকে প্রমোদসাগরে
মত্ত ঘূর্ণ্যবেগে, তপ্তদেহে অর্দ্ধরাত্রে
সঙ্গিনীরে লয়ে, উচ্ছ্বসিত সুরাপাত্রে
তৃষার গলায়ে কর পান, থাক সুখে
নিত্য-মত্ততায়!—এত বলি' হাসামুখে
ফিরে আসি আপনার সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা
আনন্দমন্দির মাঝে, নিভৃত নিরালা
শান্তিময়!—প্রভু, হেথা কেহ নহ তুমি
আমি যেথা রাজা! আমার নন্দনভূমি
একান্ত আমার! দুর্লভ পরশখানি
দুর্ম্মূল্য দুকূল, সর্ব্বাঙ্গে দিয়েছি টানি'
সগৌরবে; আলিঙ্গন কুঙ্কুম চন্দন
সুগন্ধ করেছে বক্ষ;—অমৃত চুম্বন
অধরে রয়েছে লাগি;—স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
সুধাস্নাত দেহ! প্রভু, হেথা তব সাথে
নাহি মোর কোন পরিচয়!

অয়ি প্রিয়ে,
ধন্য আমি, আপনাতে রেখেছি ভরিয়ে

তব প্রেম ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি' ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণ-কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট !
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট্ !
কি দেখিছ মুখে মোর পরমবিস্মিত,
ডাগর নয়ন মেলি ? হে আত্ম-বিস্মৃত,
আপনারে নাহি জান তুমি, মোর কথা
নারিবে বুঝিতে ! বড় পেয়েছিনু ব্যথা
আজি, বড় বেজেছিল অপমান, যবে
অপোগণ্ড সাহেবশাবক, রূঢ়রবে
করিল লাঞ্ছনা ! হায়, এ কি প্রহসন
এ সংসার ! ক্ষুদ্র ব্যক্তি বড় সিংহাসন
কার পরিহাসবশে করে অধিকার,
কোন্ অভিনয়চ্ছলে নিখিল সংসার
বড় বলি মান্য করে তারে ? মিথ্যা আজ
যত চেষ্টা করি আমি, সমস্ত সমাজ
এক হয়ে, নত করে' রাখিবে আমারে
তার কাছে, গণ্য আমি নাহি করি যারে
সমকক্ষ, একাকী যে যোগ্য নহে মোর !
জেনো প্রিয়ে বাহিরের প্রকাণ্ড কঠোর

সংসার এমনি ধারা অদ্ভুত আকার,
কে যে কোথা পড়িয়াছে, স্থির নাহি তার
অস্থানে অকালে! আর্ত্তনাদে অট্টহাসে
চলেছে উৎকট যন্ত্র অন্ধ ঊর্দ্ধশ্বাসে
দয়ামায়া শোভাহীন,—বিরূপ ভঙ্গীতে
সর্ব্বাঙ্গ নড়িছে তার; সৌন্দর্য্য সঙ্গীতে
কে চালাবে তারে? সেথা হতে ফিরে এসে
স্মিতহাস্যসুধাস্নিগ্ধ তব পুণ্যদেশে,
কল্যাণকামনা যেথা নিয়ত বিরাজে
লক্ষ্মীরূপে, সেই তব ক্ষুদ্র গৃহমাঝে
বুঝিতে পেরেছি আমি ক্ষুদ্র নহি কভু,
যত দৈন্য থাক্ মোর, দীন নহি তবু;
তুমি মোরে করেছ সম্রাট্! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট! পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি! আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে! হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর অন্তঃপুরে! পূর্ব্বে একদিন
বধির জীবন ছিল সঙ্গীত-বিহীন,

প্রেমের আহ্বানে আজি আমার সভায়
এসেছে বিশ্বের কবি, তারা গান গায়
মোদের দোঁহারে ঘিরি ;—অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার ! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান !—আধুনিক রাজধানী,
আমি তারি আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরীর কড়ি, ফিরে আসি দিনশেষে
কর্ম্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু, কোন কীর্ত্তি নাই,
তবু খ্যাতিহীন আমি কত সঙ্গী পাই
কত গৌরবের ! তব প্রেমমন্ত্রবলে
ইতর জনতা হতে কোথা যাই চলে'
নব দেহ ধরি ! প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে, দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ

বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
শিবের মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানমুখী করে
করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথান্বিত তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে ;—হাত ধরে' মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে ! সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্,
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর !

হের সখি গৃহছাদে
জ্যোৎস্নার বিকাশ! এত জ্যোৎস্না এত সাধে
আর কোথা আছে! প্রভুত্বের সিংহাসন
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারে করিছে যাপন
কর্ম্মশালে কর্ম্মহীন নিশি! এ কৌমুদী
আমাদের দুজনের! দুটি অঁাখি মুদি'
বারেক শ্রবণ কর—সুগম্ভীর গান
ধ্বনিতেছে বিশ্বান্তর হতে, দুটি প্রাণ
বাঁধিছে একটি সুরে! স্তব্ধ রাজধানী
দাঁড়াইয়া নতশিরে, মুখে নাহি বাণী!

গরিলা ও শিম্পাঞ্জী সম্বন্ধে গার্ণার সাহেবের অভিজ্ঞতা।

গার্ণার সহেব বানরের ভাষা শিখিবার জন্য আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এ সংবাদ বোধ হয় আমাদের পাঠকেরা অনেকেই জানেন। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আজও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই বানরজাতির আহার বিহার সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতূহলজনক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিব।

এন্‌কামী নামক এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্য প্রদেশে গার্ণার তাঁহার বাসের জন্য এক সুদৃঢ় খাঁচা প্রস্তুত করিয়াছেন। সাহেব তাঁহার

এই খাঁচার নাম দিয়াছেন "গরিলাদুর্গ।" দুর্গের চারিদিকে কদলী-বন, এই বনে গরিলার একাধিপত্য। পাঠক মনে করিবেন না, গরিলারা সুপক্ক, কাঞ্চনবর্ণবিশিষ্ট কদলীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। সুপক্ক কদলী অপেক্ষা কলার থোড়ই ইহারা অধিক রুচিপূর্ব্বক আহার করে।

গার্ণার সাহেব একদিন দেখিলেন একটি মধ্যবয়স্ক গরিলা তাঁহার খাঁচার নিকট আসিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। গহন অরণ্যে এই শ্বেতকায় মানবসন্তান-টিকে দেখিয়া তাহার মনে নিবিড় বিস্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র ভয় বা বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহার মুখে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। যতক্ষণ সে সাহেবের দিকে তাকাইয়া ছিল, সাহেব ততক্ষণ ছবির ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া ছিলেন; কিয়ৎ-ক্ষণ পরে গরিলাটি নিকটবর্ত্তী এক ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। সে কোনপ্রকার শব্দ করে কি না জানিবার জন্য সাহেব উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, এবং তিনি শুনিতে পাইলেন গরিলাটি ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একটি বিস্ময়ব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিল।

শিম্পাঞ্জী ও গরিলার মধ্যে এমন কতকগুলি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় যাহা এন্‌কামীর অসভ্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে; এই অসভ্য জাতির "হাঁ" এবং শিম্পাঞ্জী ও গরিলার "হাঁ" প্রায় একপ্রকারেই উচ্চারিত হয়।

গার্ণার সাহেবের সঙ্গে একটি বৃহৎ কুক্কুর আছে, একদিন কুক্কুরটি তাঁহার খাঁচার বাহিরে কিঞ্চিৎদূরে দাঁড়াইয়া একখণ্ড হাড় চিবাইতেছে, এমন সময়ে গার্ণার দেখিলেন প্রায় ত্রিশ ফিট দূরে এক সুবৃহৎ স্ত্রী-গরিলা তাহার শাবককে ক্রোড়ে লইয়া অতি ধীরে ধীরে সাবধানতার সহিত কক্কুরটির দিকে অগ্রসর হইতেছে;

যখন সে কুকুরটির অত্যন্ত নিকটে আসিল তখন পর্য্যন্ত কুকুর তাহার বিপদ বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং নিবিষ্টচিত্তে হাড়ই চিবাইতেছিল। কিন্তু কুকুরকে আক্রমনোদ্যত দেখিয়া সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্ত্রী-গরিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের ঘোড়া উঠাইলেন। গরিলা এতক্ষণ পরে হঠাৎ সাহেবকে দেখিতে পাইল, মুহূর্ত্তের জন্য সে মাটীর উপর স্থির হইয়া বসিল, তাহার পর সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গহন বনে প্রবেশ করিল। শাবকটিকে হস্তগত করিবার জন্য সাহেবের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু খাঁচার এত নিকটে গরিলা হত্যা করিলে পাছে অন্যান্য গরিলা আর সেদিকে অগ্রসর না হয় এই আশঙ্কায় তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে স্ত্রী-গরিলাটি তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

অনেকের বিশ্বাস গরিলারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে; কিন্তু গার্ণার সাহেব এ পর্য্যন্ত তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পান নাই। ইহারা সর্ব্বদা একস্থানে বাস করে না, এমন কি ইহাদিগকে দুইরাত্রি একাদিক্রমে একস্থানে থাকিতে দেখা যায় না। দিনের বেলা ইহারা আহারান্বেষণে জঙ্গল হইতে জঙ্গলান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে রাত্রি হয় সেখানেই রাত্রির মত থাকিয়া যায়। একদিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময় একপ্রকার বিকট চীৎকার শব্দে গার্ণার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হয়; সাহেব উঠিয়া, বন্দুক ধরিয়া খাঁচার মধ্যে বসিয়া রহিলেন, এই চীৎকারের অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, গরিলা-সর্দ্দার এই শব্দে বিভিন্ন বৃক্ষবাসী গরিলা প্রজাদিগকে স্থানত্যাগের অনুমতি প্রদান করিতেছে। গার্ণার সাহেব বলেন, এই শব্দ ভয়, ক্রোধ কিম্বা হর্ষ-

প্রকাশক নহে, কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ইহা অনুমতিসূচক শব্দ।

গরিলারা চলিয়া যাইবার সময় প্রথমে দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ এবং তৎপরে বামহস্ত ও দক্ষিণ পদ যুগপৎ প্রসারিত করিয়া থাকে, শিম্পাঞ্জীরা চলিবার সময় হাতের পাতা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চলে। অনেকের বিশ্বাস গরিলারা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চীৎকার করে। কিন্তু গার্ণার সাহেব বলেন, ইহারা রাত্রে সচরাচর চীৎকার কিম্বা কোন-প্রকার শব্দ করে না, এই দেশের অরণ্যে একজাতীয় বৃহৎ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিকট চীৎকার করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর গরিলার স্বরের অনুরূপ, সুতরাং এই পক্ষীর শব্দকেই গরিলার চীৎকার বলিয়া সাধারণের মনে হয়।

গরিলারা রাত্রিকালে বৃক্ষের উপর বাস করে। কিন্তু সর্দ্দার-গরিলা সর্ব্বদাই আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। রাত্রিযাপনের জন্য সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান বাছিয়া লয়।

গার্ণার সাহেব গরিলা সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন। গল্পগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাতে গরিলার অসাধারণ বল, অসীম সাহস এবং ভীষণ ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গরিলাকে আক্রমণ কি তাহাদের কোন ক্ষতি না করিলে প্রায়ই তাহারা কাহারো প্রতি অত্যাচার করে না।

অসভ্য গালোই জাতির মধ্যে মনুষ্য ও গরিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই :—

"এনিয়াম্বি" (সৃষ্টিকর্ত্তা) চারি পুত্রের সহিত আকাশে বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার তিন পুত্র পৃথিবীতে নাবিয়া আসিল এবং মর্ত্ত্যলোকে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় এ সম্বন্ধে প্রবল তর্ক উপস্থিত করিল। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে

যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সে বলিল নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হইবে। কিন্তু অন্য দুই পুত্রের মত হইল যে, অরণ্যবাসই শ্রেয়স্কর এবং প্রচুর আরণ্য ফলমূলে জীবনধারণ করা বড়ই সুখজনক, নগরে বাস করার অনেক ঝঞ্ঝাট্। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নগরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। ছোট দুই ভাই ও নিজেদের জেদ ছাড়িতে চাহিল না, তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে আরণ্য ফল মূলে তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন হইলে তাহার সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। নিরুপায় দেখিয়া তাহাদের একজন, নগরবাসী ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি ভিক্ষা করিয়া আনিল, অন্য ভাই কাঠ কুড়াইয়া সেই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিল। কিছু কাল অতি-বাহিত হইলে, এক দিন প্রবল বর্ষায় তাহাদের সেই সযত্নরক্ষিত অগ্নি নিভিয়া গেল, আহারসংগ্রহও কঠিন হইয়া উঠিল। তখন সেই অরণ্যবাসী ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ সে কনিষ্ঠকে নাগ-রিক ভ্রাতার নিকট হইতে অগ্নি আনিতে অনুমতি দিয়া আহা-রান্বেষণে বনান্তরে প্রস্থান করিল। কিন্তু আহার সংগ্রহপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুখে নাসিকা গর্জ্জন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছে, অগ্নি আনা হয় নাই। দুই ভ্রাতার বিবাদ বাধিল, অবশেষে উভয়ে পৃথক্ হইল। ছোট ভাই গভীর জঙ্গলে চলিয়া গেল, এবং ভ্রাতৃগণের সংসারচ্যুত হইয়া নিতান্ত বন্য স্বভাব লাভ করিল। ক্রমে তাহার গাত্রে লোম উদ্গত হইয়া তাহার বস্ত্রহীনতা দূর করিল, সঙ্গে সঙ্গে পশুত্বও পূর্ণমাত্রায় তাহার দেহ এবং মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল। এই ব্যক্তি গরিলাদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

অন্যভ্রাতা নগরের নিকটে গিয়া কুটীর বাঁধিল, এবং বন্য ফল

মূল তাহার জীবিকার প্রধান সহায় হইলেও সে সময়ে সময়ে তাহার নগরবাসী ভ্রাতার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক কাল কাটাইতে লাগিল। এই ব্যক্তি 'বুসম্যান' বা 'বন্যজাতির' পূর্ব্বপুরুষ। আর নগরবাসী ভ্রাতা পৃথিবীর সভ্যজাতির আদি-পুরুষ।

গার্ণার সাহেব বলেন, এই সৃষ্টিবিবরণ কৌতূহলজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি ত্রুটী অসংশোধিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। গ্যালোই পণ্ডিতগণ এই গল্পে রমণীর অবতারণা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই ভ্রমের জন্য গল্পের আর একটি গুরুতর দোষ বাহির হইয়াছে, স্ত্রী যখন নাই, তখন ভ্রাতায় ভ্রাতার মনান্তরের জন্য পৃথক্ হইবার কারণ কে?

অসভ্যজাতিগণ গরিলার মাংস ভক্ষণ করে না। গার্ণার সাহেব বলেন, স্বজাতি ভাবিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ যে ইহারা গরিলার মাংস আহার করে না এরূপ নহে; কি শারীরিক বল, কি সাহস, কোন বিষয়েই গরিলা এই সকল অসভ্যজাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে, সুতরাং সম্ভ্রম অপেক্ষা ভয়ই ইহাদের গরিলা-মাংস ভক্ষণের প্রধান অন্তরায়। তিনি একথাও বলেন যে, কোন কোন নরমাংসভোজী জাতিবিশেষ—'পাংয়ুই' নামক এক অসভ্য জাতি—বিশেষ তৃপ্তির সহিত গরিলামাংস ভোজন করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে এই জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা পঙ্গপালের ন্যায় 'ওগোয়ুই' পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। গার্ণার সাহেব ইহাদিগকে পশ্চিম আফ্রিকার ইহুদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আফ্রিকার এই অংশে বাণিজ্যের ইহারা প্রধান

সহায়। কারণ ইহারা গভীর অরণ্য হইতে গজদন্ত, মৃগচর্ম্ম, আবলুস প্রভৃতি নানাপ্রকার কাষ্ঠ এবং পর্ব্বত হইতে বিবিধ মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বণিকদিগের নিকট অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করে।

গার্ণার সাহেবের বিশ্বাস শিম্পাঞ্জী জাতীয় বনমানুষ গরিলা অপেক্ষা সামাজিক ও মনোবৃত্তিসম্পন্ন। যদিও এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শিম্পাঞ্জী ও গরিলার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করায় তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তরই হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা বোধ হয় বাহুল্য নহে যে, অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার মতভেদ হউক না কেন, সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডারুইন সাহেবের সহিত তাঁহার মতভেদ লক্ষিত হয় না। কারণ ডারুইন সাহেবের মতেও "গরিলা প্রভৃতি অসামাজিক বানরবংশ অপেক্ষা শিম্পাঞ্জী জাতীয় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং সামাজিক বানরবংশই মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ হইবার অধিক উপযোগী হইয়াছিল"। *

গার্ণার সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে, গরিলার মনোবৃত্তি মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন। অরণ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও নির্জ্জন অংশেই ইহারা বাস করিতে ভালবাসে। প্রতিপালকের প্রতি অনুরক্ত হওয়া দূরের কথা, বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে ইহাদিগকে বাধ্য করা যাইতে পারে। গার্ণার সাহেব তাঁহার অভিজ্ঞতায় এ সম্বন্ধে একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত অবগত নহেন, কেবল একটিমাত্র গরিলাশিশুকে অনেক যত্নে পোষ মানান গিয়াছিল। একবার কতকগুলি গরিলাকে ধরিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা

---

* Descent of Man Chapter 2nd pp. 63. 64.

করা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাহারা বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াও তাহাদের সহজাত উগ্রতা এবং অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করে নাই। কিন্তু শিম্পাঞ্জী বনমানুষেরা মনুষ্যের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে এবং ইহাদিগের অনেক সৎগুণও দেখা যায়।

গার্ণার সাহেব নিজে একটি শিম্পাঞ্জীশিশু পুষিয়াছেন, তাঁহার মতে এটি শিম্পাঞ্জী বংশের কুলতিলকস্বরূপ। "ওগোয়ুই" পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী একটি আরণ্য প্রদেশের কোন জলাভূমিতে ইহাকে পাইয়াছেন বলিয়া সাহেব ইহার নাম রাখিয়াছেন "মোজেস্" বা "মুসা"। মুসা সাহেবের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত; অনাথ শিশু যেমন দয়ার্দ্রচেতা ব্যক্তির নিকট আপনার দুঃখ ব্যক্ত করে, মুসাও সেইরূপ নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা আপনার মনোভাব প্রকাশ করে এবং পালিত কুক্কুরের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ করিয়া বেড়ায়। সাহেব তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখেন না, প্রয়োজন হইলেই সে জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার ফল মূল খাইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে। মুসা তাঁহার নির্জ্জন প্রবাসের প্রিয়তম সঙ্গী; কত প্রফুল্ল, অরুণকিরণরঞ্জিত উষায় কিম্বা নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে এই জনমানবশূন্য বনস্থলীতে বসিয়া যখন তাঁহার বহু দূরবর্ত্তী গৃহে স্নেহময় পুত্রকন্যার সুকোমল মুখ মনে পড়ে তখন এই ক্ষুদ্র বানরশিশুকে আদর ও যত্ন করিয়া তিনি অনেক শান্তি লাভ করেন। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত আবদারে সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত হইতে হয়, এমন কি, কখন কখন সে তাঁহার কাজেরও ব্যাঘাত জন্মায়। বেলা দশটার সময় সাহেব তাহাকে কাপড় পরাইয়া তাহার ঘরে শুয়াইয়া রাখেন,

সেখানে সে দুপুর পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, তাহার পর উঠিয়া আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসে। অনেক সময় তাহাকে কোলে লইয়াই সাহেব লেখাপড়ার কাজ করেন। রাত্রেও সে তাহার ঘরে ঘুমাইয়া থাকে, সকালে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া খাবার চাহে। সাহেবের নিকট অন্য কাহাকেও আসিতে দেখিলে মুসার বড়ই অসহ্য বোধ হয়। একদিন তিনি দেখিলেন, একটি শিম্পাঞ্জীশিশু তাঁহার খাঁচার নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তিনি মুসাকে তাহার সহিত আলাপ করিতে পাঠাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

সাহেব মুসাকে ইংরাজী শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যদিও তিনি এখন পর্য্যন্ত কোন ফল লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অতি অল্পদিন তাহার শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কথা কহিবার চেষ্টায় মুখ নাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাহেব তাহাকে নানা প্রকার সঙ্কেত শিখাইতেছেন। নূতন কিছু দেখিলে বা শুনিলে মুসা সে কথা তাহার প্রভুর নিকট অস্পষ্ট স্বরে ব্যক্ত করে এবং সাহেব যদি সে সময় কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে সে তাঁহার হাত পা টানিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে।

গার্ণার সাহেব শিম্পাঞ্জী বনমানুষের আর এক অদ্ভুত আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন। শিম্পাঞ্জীকে স্থানীয় অসভ্য 'এন্কামী' জাতি 'এন্চিগো' বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল অসভ্যজাতিই অতিরিক্ত মাত্রায় নৃত্যগীতপ্রিয়, 'এন্কামী'গণও সর্ব্বদা নৃত্যগীতে মত্ত থাকে। ইহারা নৃত্যকালে যে বাজনা বাজায় সেই

বাদ্যযন্ত্রকে 'এন্‌গামা' বলে এবং ইহাদের নৃত্যের নাম 'ফনেজো'। এই প্রদেশের শিম্পাঞ্জীগণকেও এই অসভ্য জাতির নৃত্যের অনুকরণে নৃত্য করিতে ও বাজনা বাজাইতে দেখা যায়। অরণ্যের মধ্যে অনেক শিম্পাঞ্জী একত্রিত হইয়া একপ্রকার অদ্ভুত বাজনা বাজাইয়া নৃত্য করে, স্থানীয় অসভ্যগণ শিম্পাঞ্জীদিগের এই বাজনাকে "এন্‌গামা এন্‌চিগো" অর্থাৎ "বনমানুষের বাজনা" এবং ইহাদিগের নৃত্যকে "কান্‌জো এন্‌চিগো" বা "বনমানুষের নাচ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। বাদ্যকর বনমানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার মৌখিক শব্দ করে, আর কতকগুলি বনমানুষ সারি বাঁধিয়া সেই বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে। বাজনা থামিলেই নৃত্য বন্ধ হয় এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠে, অল্পক্ষণ পরে আবার নৃত্য আরম্ভ হয়, এইরূপে ইহাদের নৃত্য দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলে। বাদ্যকর বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে অন্য একটি শিম্পাঞ্জী আসিয়া তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করে, কখন কখন একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনও বাজাইতে থাকে।

"এন্‌গামা এন্‌চিগো" অর্থাৎ "শিম্পাঞ্জীর বাদ্যযন্ত্র" কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত ইহা স্থির করিবার জন্য গার্ণার সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে স্থানীয় অসভ্য জাতির নানা মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলে ইহা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড কিম্বা বৃক্ষবল্কল মাত্র, কেহ কেহ বলে শিম্পাঞ্জীরা হস্তদ্বারা তাহাদের বক্ষস্থল তাড়নাপূর্ব্বক বাদ্যধ্বনি করে। কিন্তু এ সমস্ত কথা গার্ণার সাহেবের বিশ্বাস না হওয়ায় তিনি অনেক অনুসন্ধানে দুই একটি "এন্‌গামা এন্‌চিগো" আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়া-

ছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, এগুলি একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র; ইহার ব্যাস সাধারণতঃ দুইফিট, এগুলি কর্দ্দম নির্ম্মিত। কিন্তু কৃত্রিম কি না তাহা গার্ণার সাহেব আজও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার পর তিনি ইহাকে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। যাহাই হউক, ইহা যে, "এন্‌গামার" সুন্দর অনুকৃতি তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গার্ণার সাহেব তাঁহার "গরিলা দুর্গে" অর্থাৎ খাঁচায় বসিয়া অধিক সংখ্যক শিম্পাঞ্জীর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনি আশা করেন তাঁহার দুর্গ স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি অনেক শিম্পাঞ্জীর নিকট পরিচিত হইবেন, এমন কি, তাহাদের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথাও কতক পরিমাণে অবগত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য।

ভারতের দারিদ্র্য যে ক্রমশই বাড়িতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? এ দারিদ্র্য হইতে দেশকে উদ্ধার করা কঠিন; সকল শ্রেণীর লোকেরাই ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন। কাহারই প্রায় স্বচ্ছল অবস্থা নহে। বিভিন্ন লোকে ইহার বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ একটি নহে। অদৃষ্টবাদ, বৈরাগ্য, উপেক্ষা, আলস্য, বাল্য-বিবাহ, সাধারণ শিক্ষার অভাব, শিল্প-

শিক্ষার অভাব, সৎসাহসের অভাব প্রভৃতি করিয়া আমাদের দারিদ্র্যের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বৈদেশিক শাসনভারে প্রপীড়িত হইয়া আমাদের স্বাধীনভাব, আমাদের উন্নতি-স্পৃহা, আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্যম উৎসাহ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। কাজেই আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজদিগের কর আদায় করিবার প্রণালীটাই দূষণীয়। স্বদেশীয় রাজাদিগের আমলে, উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ করস্বরূপে লওয়া হইত, অর্থ লওয়া হইত না। শুধা হাজা অজন্মা হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। এখন শস্যের অবস্থা যাহাই হোক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ করস্বরূপ প্রজাকে দিতেই হইবে। বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষ না হইলে, বর্ত্তমান রাজসরকার কখনই প্রজাদিগকে ছাড় দেন না। তা ছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে অজন্মা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছাড় দিবার কোনও একতিয়ার নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ হইলে, সমস্ত দেশের অবস্থাই মন্দ হইয়া পড়ে। কৃষি ও বাণিজ্য দুই যদি আমাদের দেশে প্রবল থাকিত, তাহা হইলে আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। একের অভাব, সময়বিশেষে অপরের দ্বারা পূরণ হইতে পারিত। তা ছাড়া, অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, উৎকৃষ্ট ভূমিতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১০০ কিম্বা ১২০ জনের মত আহার যোগান্ হইতে পারে—সেই ভূমির উপর যদি ১৫০, কিম্বা ২০০ লোক নির্ভর করিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের জঙ্গল, বন, মরু-স্থান প্রভৃতি বাদ দিয়া যদি কেবল কৃষিযোগ্য ভূমি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে প্রতি বর্গমাইলে

২০০ হইতে ৩০০ লোক অবস্থিত। সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৬ জনের কৃষিই একমাত্র নির্ভর স্থল। অতএব আমাদের দারিদ্র্যের কারণ এইখানেই তো হাতে-হাতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য, বিজ্ঞান-সঙ্গত আধুনিক উপায়সকল অবলম্বন করিলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে হইলে, কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করা চাই। কিন্তু এই বাণিজ্যের কতকগুলি অন্তরায় আছে। কেহ কেহ মনে করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যমাত্রই নীচ কাজ। কেহ বা দ্রব্যবিশেষের ব্যবসায়ে আপত্তি করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের আপত্তি সমুদ্রযাত্রা। এই সমুদ্রযাত্রার বাধা খণ্ডন না হইলে, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের গোঁড়া লোকেরাও হয়তো বাণিজ্যের কথা শুনিবামাত্রই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রচলিত বচনটি আওড়াইবেন এবং আর্য্যমহিমা কীর্ত্তনকালে সতাহলে বলিবেন, পুরাকালে আমাদের পোতসকল মার্কিনদেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। কিন্তু তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন "কালাপাণি" পার হইয়া বাণিজ্যার্থে বিলাতে গিয়া বাস করুন দেখি, অমনি তখন তাঁহারা তাহাকে জাত্যন্তর করিবার জন্য ঘোঁট করিতে থাকিবেন। আর একদল এইরূপ চীৎকার করেন, আমাদের দেশের টাকা ইংরাজেরা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, বিলাতের কল কারখানায় আমাদের দেশের শিল্পসকল লুপ্ত করিতেছে। এ কথাগুল সত্য, কিন্তু ইহা নিবারণের জন্য তোমরা কি উপায় করিতেছ? শুধু কাঁদুনি গাহিয়া কি ফল? যদি কেবলমাত্র যোগ সাধন করিয়া, বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া

পারত্রিক ধ্যান ধারণায় জীবন কাটাইতে চাহ—তাই কর। কিন্তু তাহা হইলে আপনাদিগের ঐহিক অবস্থা লইয়া আক্ষেপ করিয়ো না কিম্বা বৈদেশিকদিগের পৌরুষে কটাক্ষপাত করিয়ো না। আজকাল যোগবলের কাল গিয়াছে, কর্ম্মবল অর্জ্জন করা এক্ষণে নিতান্তই আবশ্যক। ইংরাজের যদি সমকক্ষ হইতে চাও, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য যদি মোচন করিতে চাও, তবে ভস্মাবশিষ্ট মৃত অতীতকে ভস্মের মধ্যে রাখিয়া, জীবন্ত বর্ত্তমানে জীবন্তভাবে কাজ করিতে থাক।

এ বিষয়ে বোম্বাইবাসীরা আমাদের অপেক্ষা দূরদর্শী ও কাজের লোক। তাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব বুঝিতে পারিয়া আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি তুলার কারখানা খুলিলেন; পূর্ব্বে যে তুলা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহা দেশেই রহিয়া গেল এবং তাহাতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য দ্রব্যের কারখানাও ক্রমশঃ ইতস্তত দেখা দিতেছে। ইহা আমাদের সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। শুধু গৃহ-বাণিজ্য হস্তগত করিলে চলিবে না, বহির্বাণিজ্যের দিকেও আমাদের হস্ত প্রসারণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমাদের দেশের বহির্বাণিজ্য সমস্তই প্রায় য়ুরোপীয়দিগের হস্তগত। আমাদের যাহা বেচিবার আছে তৎসমস্ত তাঁহারা এখানে ক্রয় করেন এবং আমাদের যাহা ক্রয় করা প্রয়োজন তৎসমস্ত তাঁহারা বিলাত হইতে এদেশে লইয়া আইসেন; শুধু লইয়া আইসেন নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যজাত ভারতবর্ষের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বণ্টন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখা

যায় না; একটি বৃহৎ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী হাত গুটা-ইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান—আর কতিপয় বৈদেশিক আসিয়া তাহাদের সমস্ত কাজ করিয়া দিতেছে। এইপ্রকার হীন অধী-নতা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তো অব্যবহিত বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অব্যবহিত বাণিজ্যের মূল মন্ত্রটি এই:—যে বাজার সর্ব্বা-পেক্ষা সস্তা সেই বাজারে মাল খরিদ কর, এবং যে বাজার সর্ব্বা-পেক্ষা মহার্ঘ্য সেই বাজারে গিয়া ঐ মাল বিক্রয় কর। যেখানে কোন দ্রব্য গোড়ায় প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বাজার, এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং যে ব্যক্তি উহা ব্যবহার করে, ইহাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ ভাবে আদান প্রদান চলে, তাহা হইলে উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। কিন্তু আজকালের দিনে, ইহা প্রায়ই কার্য্যত ঘটিয়া উঠে না। বড় একটা কোন কাজ করিতে গেলেই দশজনে মিলিয়া করিতে হয় এবং অধিক মূল্যের যন্ত্রাদি খরিদ না করিলে তাহা সহজে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক্ষণে কারখানার অধ্য-ক্ষেরাই দ্রব্য প্রস্তুতকারীর স্থলাভিষিক্ত এবং সওদাগরেরাই ব্যবহারকারীর স্থলাভিষিক্ত। যাহাতে এই উভয় দলের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কাজ চলিতে পারে তাহাই বিলাতের বণিকদের বিশেষ চেষ্টা।

কিন্তু আমাদের দেশে এই লভাজনক বাণিজ্যনিয়মটির মর্ম্ম কেহই বুঝে না। এ দেশের সহিত যে নিয়মে বাণিজ্যকার্য্য হইয়া থাকে তাহা এইরূপ:—বিলাতের কারখানা-ওয়ালা কোনও দ্রব্যবিশেষ প্রস্তুত করিয়া সেখানকার কোনও বড় সওদাগরকে প্রথম বিক্রয় করেন; তৎপরে ভারতবর্ষের কোনও

য়ুরোপীয় বণিকের কোন য়ুরোপীয় প্রতিনিধি সেই দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভারতে চালান করেন। সেই দ্রব্য ভারতে পৌঁছিলে, হাউসওয়ালা তাঁহার অধীনে যে সকল ছোট ছোট কার্য্যস্থান ও আড়ৎ আছে, সেই সকল স্থানে উহা চালান করিয়া দেন; এই প্রকারে ঐ দ্রব্য ভারতবর্ষে সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিভিন্ন খরিদ্দারের আয়ত্তের মধ্যে আইসে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই কারবারে যতগুলি মধ্যবর্ত্তী থাকেন সকলেরই কিছু না কিছু লাভ হয় এবং ইহার আদানপ্রদানে যতই হাতফের হয় ততই দ্রব্যটির মূল্য মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় পণ্যেরও এই নিয়মে মূল্য স্থির হয়। ভারতবর্ষে কোন দ্রব্য খরিদ করিয়া বিলাতে চালান করিতে হইলে, এরূপ মূল্যে সেখানে বিক্রয় করিতে হয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তী-দিগের লভ্য দিয়াও নিজের কিছু লভ্য অবশিষ্ট থাকে।

এইরূপ নিয়মে যখন বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, য়ুরোপীয় ব্যবসাদার য়ুরোপীয় দ্রব্যজাতের মূল্য যতদূর পারেন বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন এবং ভারত-বর্ষীয় দ্রব্যজাত যতদূর পারেন সুলভ মূল্যে খরিদ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই উভয় স্থলেই ভারতবর্ষের খরিদ্দার ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে এবং এইরূপ কারবারে ভারতবর্ষ ধনী হওয়া দূরে থাক্, দরিদ্র হইয়া পড়ে। এস্থলে আর একটি কথা মনে করা আবশ্যক। য়ুরোপীয় বণিকের দেশে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সুতরাং য়ুরোপীয় বণিক আমাদের টাকায় বিনিময়-মূল্য অনু-সারে তাঁহার লভ্যের হিসাব করিয়া থাকেন। বিলাতি জিনিস বিক্রয় করিয়া যে মূল্য প্রাপ্ত হন তাহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করিতে হয়—কেন না স্বর্ণমুদ্রাই তাঁহার দেশের প্রচলিত মুদ্রা।

কিন্তু তিনি যখন এ দেশের দ্রব্য খরিদ করেন তখন টাকার মূল্যে খরিদ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মুদ্রা-বিনিময়ে ইংরাজ বণিকেরই লাভ। তবে যে টাকার ঘাট্‌তি সম্বন্ধে এতাধিক চীৎকার শুনা যাইতেছে তাহার কারণ—যতদিন এই অব্যবহিত ঘাট্‌তি অনতিরিক্ত পরিমাণে ছিল ততদিন ইংরাজ বণিকের ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন টাকার মূল্য এতটা কমিয়া গেল, যে, দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়াও সে ঘাট্‌তি পূরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখনই এই চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। যে সকল য়ুরোপীয়েরা ভারতবর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগ করে তাহারাও টাকার ঘাট্‌তিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাকার ঘাট্‌তির দরুণ যা কিছু ক্ষতি সমস্তই বৈদেশিকদিগের। যদি বহির্বাণিজ্য আমাদের দেশীয় লোকদের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে ভাবী মুদ্রাবিপ্লব সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিত না।

পণ্য দ্রব্যের উপর কোন বাটা নাই। ভারতবাসীরা এ গুরুতর কথাটা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না। যে ভারতবর্ষীয় সওদাগর সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার করেন তাঁহাকে বাটার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্ :— মনে কর, কোন ভারতবর্ষীয় বণিক ১০০০৲ টাকায় একজন ইংরাজ বণিককে শস্য বিক্রয় করিল। এবং সেই টাকায় একটা বিলাতি কল খরিদ করিল। এক্ষণে, প্রতি টাকায় যদি ১শিলিং আড়াই পেন্স পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিলাতি কলের দাম হইল ৬০ পৌণ্ড ৮ শিলিং ৪ পেন্স মাত্র। যদি ঐ ভারতবর্ষীয় বণিক, ঐ শস্য এখানে বিক্রয় না করিয়া একেবারে বিলাতে চালান করেন, তাহা হইলে এখানকার অপেক্ষা তিনি সেখানে অধিক মূল্য পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এবং

তিনি যদি ঐ শস্য বিক্রয় করিয়া ১০০০৲ টাকা কিম্বা ১০০ ফ্লরিন মুদ্রা পান তাহা হইলে তিনি ঐ টাকায় ১০০ পৌণ্ড মূল্যের কল খরিদ করিতে পারিবেন এবং ঐ কল ভারতবর্ষে চালান করিয়া বিক্রয় করিলে তিনি ১,৬৫৫ টাকা ৷৷০ আনা প্রাপ্ত হইবেন। কারণ প্রতি টাকার বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং আড়াই পেন্স হইলে ঐ ১০০ পৌণ্ডের বিনিময় মূল্য, ১,৬৫৫৷৷০ টাকা হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সাক্ষাৎভাবে বিলাতের সহিত কারবার না করিলে ভারতবর্ষীয় বণিকের কতটা ক্ষতি হয়। শুধু ঐখানে ক্ষতির শেষ হয় না। সেখানে কোন ইংরাজ আড়ৎদারের ওখানে ভারতবর্ষ হইতে মাল পাঠাইলে, বিলাতের আড়ৎদারি দিতে হয়—তা ছাড়া সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যত হাতফের হয় সকলকেই কিছু না কিছু সেই পরিমাণে লভ্য দিতে হয়। কিন্তু খরিদ বিক্রয় যদি বিলাতেই হয় তাহা হইলে অত খরচ পড়ে না—যাহা কিছু দিতে হয় তাহা একজন ব্যবসাদারকেই দিতে হয়। জাহাজভাড়া প্রভৃতি খরচ এ স্থলে ধরা গেল না। কেন না, সাক্ষাৎ ভাবেই চালান কর বা কোন বিলাতের আড়তে পাঠাও সে খরচ উভয়েতেই সমান। অতএব, এখন যে প্রণালীতে বিলাতের সহিত কারবার চলে তাহাতে সমস্ত লভ্য বৈদেশিকদের হস্তে যায়, এবং সাক্ষাৎভাবে কারবার করিলে যাহা কিছু লাভ হয় সমস্ত দেশীয়দের হস্তে আইসে।

সাক্ষাৎ বাণিজ্যের নৈতিক ফলও বিলক্ষণ আছে। ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতে বাণিজ্যার্থে কিছু দিন বাস করিলে জানিতে পারেন আমাদের কত প্রকার প্রাকৃতিক সম্বল ধনাগমের কত অসংখ্য পথ। বিদেশীয় লোকদিগের কি কি দ্রব্য প্রয়োজন তাহা

তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং তাহাদের কিসে অভাব পূরণ করিয়া কিরূপে আমরা লাভবান হইতে পারি তাহারও নানা প্রকার সন্ধান জানিতে পারেন। তা ছাড়া, আমাদের এখন যে উদ্যম সাহসের অভাব, সাক্ষাৎ বাণিজ্যে সেই উদ্যম সাহস অর্জ্জন করিতে পারি। এবং এই প্রকার সাহসিক উদ্যমের অনুশীলনের দ্বারা আমাদের জাতীয় চরিত্র সবল ও স্বাধীন ভাবাপন্ন হইতে পারে।

প্রথম প্রথম বিলাতে বিলাতি আড়তে মাল চালান করিয়া আড়ৎ স্থাপন করিয়া লাভ বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় সওদাগরের নিজ হিসাবে কাজ চালাইবার জন্য সেখানে পণ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় যে, যে দ্রব্য বিলাতে বারমাস কাটতি হয় সেই দ্রব্য লইয়াই প্রথম কাজ আরম্ভ করিতে হয়। যথা বিবিধ শস্য-বীজ, চামড়া, তৈল প্রভৃতি। এবং এসকল দ্রব্যের কারবার করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। বিলাতে কিছু দিন বাস করিলেই ভারতবর্ষীয় সওদাগর জানিতে পারিবেন যে, সেখানে সমস্ত দ্রব্য একেবারে বিক্রয় হয়—খুচরা খুচরা বিক্রয় হয় না। এবং বিক্রয়েরও নানা প্রকার পদ্ধতি আছে। ইংলণ্ডে অধিকাংশ পণ্য দ্রব্যই সমগ্রভাবে নিলামে বিক্রয় হয়। যখন বাজার চড়া থাকে তখন শীঘ্র বেচিয়া ফেলিতে হয়, কিম্বা যদি মনে হয় আরও চড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে কিছু দিন ধরিয়া রাখিতে হয়। এইপ্রকার বাজারের অনিশ্চিততার ভয় পাইবার কারণ নাই, যে হেতু ভারতবর্ষে ঐ সব দ্রব্য যে মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহা অপেক্ষা বিলাতের বাজার অনেক চড়া থাকে এবং খরিদ্দারদিগের সংখ্যাও অনেক।

শস্য প্রভৃতি কাঁচা মাল বিক্রয় করিতে কোন মুস্কিল নাই—

বারমাসই উহা সেখানে বিক্রয় হয়। কিন্তু সেখানকার তৈয়ারী মাল কিরূপে খরিদ করিতে হয় সে বিষয়ে একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। ইংলণ্ডে সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যেই থাকুক, তিনি য়ুরোপীয়ই হউন বা ভারতবর্ষীয়ই হউন সেখানকার কোন ব্যাঙ্কে তাঁহার নগদ টাকার খাতা থাকা চাই। কোন কারখানাওয়ালা ভারতবর্ষে চালানের জন্য কোন মালটাকে ছাড়িয়া দিবেন না যদি কারখানাওয়ালার এই বিশ্বাসটা না থাকে যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা কোন মাতব্বর জমিদারের নিকট আদায় হইবে। এই সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবহার এই, জাহাজে মাল উঠাইবার পূর্ব্বেই মালের দাম বুঝাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা মাল বিক্রয় করে, তাহাদিগের দাম প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবার কাজ সেখানে Messrs Hutchinson & Co. করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সওদাগরের প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি লণ্ডনে থাকেন তাঁহার নিকট মালের চালান প্রথম আইসে, তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পান তাহা কোন লণ্ডন ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকেন। সেই লণ্ডনের ব্যাঙ্কের শাখা ভারতবর্ষেও আছে বুঝিতে হইবে। সেই জমা টাকার মাতব্বরিতে ঐ প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ আবশ্যকীয় মালের ফরমাইস করেন, কিন্তু তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, যাহাতে সকল সময়েই ব্যাঙ্কে কিছু অবশিষ্ট টাকা মজুদ থাকে। এবং কয়েকবার এইরূপ ক্রয়বিক্রয় হইবার পর ব্যাঙ্কের টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া একটা মূলধন জমিয়া যায়—তখন আর কোন ভয় থাকে না। তখন সকল সময়েই ইচ্ছামত খরিদাদি করা যাইতে পারে।

হচিনসন কোম্পানীর নিকট যদি কেহ মাল চালান করে, সেই মাল যতদিন না বিক্রয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মূল্যের জন্য

চালানকারীকে অপেক্ষা করিতে হয় না। উক্ত কোম্পানীর ভারতবর্ষীয় কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট চালানকারী বিলেডিং অর্পণ করিবামাত্র ঐ মালের মূল্যের শতকরা ৭৫ টাকা তখনই আদায় করিতে পারেন। ভারতবর্ষেও এই প্রণালীতে কাজ হইয়া থাকে; আড়ৎদারের মারফৎ বিলাত হইতে মাল না আনিয়া ভারতবর্ষীয় সওদাগর নিজ বন্দোবস্তে সেই মাল আনিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার আড়ৎদারি খরচটা বাঁচিয়া যায়। এবং ইংলণ্ড হইতে সাক্ষাৎভাবে মাল খরিদপত্র করিলে সেই মাল কারখানা-মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে—তাহাতে অনেক সস্তা পড়ে। ভারতবর্ষের মাল ইংলণ্ডে চালান করিয়া সেখানে সাক্ষাৎ ভাবে বিক্রয় করিলে তাহাতেও সওদাগরের অনেক সুবিধা হয়। আর কিছু না হউক, আড়ৎদারির খরচটা তো বাঁচিয়া যায়। আর এক কথা এই, দেশের সমস্ত বাণিজ্য বৈদেশিকদিগের হস্তে থাকিলে, দেশীয় অর্থাগমের পথসকল উদ্ভাবন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যেহেতু আমাদের অভাবের জন্য যদি বৈদেশিকদিগের উপর নির্ভর করা না হয় তবে আমাদের অভাব পূরণ করিয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের স্বার্থ যে, আমাদের অভাব আমাদের দেশ হইতে পূরণ না হয়।

ভারতের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে এসিয়ার সকল দেশ অপেক্ষা বাণিজ্যবিষয়ে ভারতের যে বিশেষ সুবিধা তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহার তিনদিকে সমুদ্র—এবং তাহার উপকূলে প্রায় ৩০০ বন্দর অবস্থিত। ভারতকে এসিয়ার বাণিজ্য-বাসা বলা যাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্যের এই একটি মূলমন্ত্র, যদি প্রত্যেক দেশ আপন আপন প্রাকৃতিক সুবিধা ও সম্বলসকলকে

যথোপযুক্তরূপে আপনার কাজে লাগায় তাহা হইলে তাহাতে সকল দেশেরই উপকার হয়। ইংরাজেরা মুখে বলেন এবং আমরাও বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে, কিন্তু আসলে আমাদের দেশের বাণিজ্য সংরক্ষিত বাণিজ্যেরই একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। কারণ, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্বলসকলকে দমাইয়া রাখিয়াই এই বাণিজ্য মাথা তুলিতে পারিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবাসী বণিক্‌দিগের উন্নতিতে য়ুরোপীয় বণিকদিগেরও উন্নতি। ভারতের বাণিজ্য যতই পরিপুষ্ট হইবে, ততই ভারতের ইংরাজি কলের অধিক চাহিদা হইবে এবং বাণিজ্যের দ্বারা ভারতবর্ষীয়েরা ধনবান হইলে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রকারের কল ধনের অভাবে এক্ষণে তাহারা কিনিতে পারিতেছে না, তখন সেই সকল অধিক মূল্যের কল তাহারা কিনিতে পারিবে। গরিব জাতি কখনই ভাল খরিদ্দার হইতে পারে না। ধন বাড়িলেই আয়েশের বৃদ্ধি হয়। এবং ভারত ধনী হইলে বিলাতের বিলাসী দ্রব্য তখন এখানে অধিকতর কাট্‌তি হইবে। ইংরাজদিগের যদি দূরদৃষ্টি থাকে তবে আমাদিগের আর্থিক উন্নতিতে তাঁহারা যেন উপেক্ষা না করেন। ভারতহিতৈষী পিনকট্‌ সাহেব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোয়াটর্লি রিভিউতে যে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম আমরা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিলাম।

শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী।

বিগত মাঘ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবনী বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভক্তিনিধি মহাশয় ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনচরিত সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাদি বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধটীতে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রমাদ অবলোকন করিয়া আমারা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, লেখক মহাশয়, লোকপ্রবাদের উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, প্রামাণ্যগ্রন্থ অবলম্বন ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বিষয়ে ততটা মনোযোগ করেন নাই, এই কারণে নানারূপ ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিতেছেন, "৪০০শত বৎসরের পূর্ব্বে অর্থাৎ যে সময়ে সম্রাট্ হুমায়ুন ও তৎপুত্র আকবর সাহা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়নগরে * সুবুদ্ধি রায় নামে জনৈক হিন্দুরাজা এবং জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন।" ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, সৈয়দহুসেন সাহ নাম কোন উচ্চ-

---

* গৌড় নগর কোথায় অবস্থিত, তৎসম্বন্ধেও লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার। তিনি লিখিয়াছেন "দিনাজপুরের উত্তরাংশে প্রসিদ্ধ গৌড় নগরে ইত্যাদি"। (নব্যভারত মাঘ ৫১৪ পৃষ্ঠা) বিখ্যাত গৌড় যে মালদহ জেলার অন্তর্গত পদ্মাতীরে অবস্থিত, আশ্চর্য্যের বিষয় লেখক মহাশয় ইহাও অবগত নহেন।

কুলোদ্ভব মুসলমান ১৪৮৯ খৃঃঅব্দ হইতে ১৫১৯ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তৎকালিক রাজধানী গৌড়নগরে রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে গৌড়াধিপতি মজঃফর সাহার মন্ত্রী ছিলেন; পরে মজঃফরকে যুদ্ধে বন্দী ও নিহত করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় নামে কোন হিন্দুরাজার বিষয় ইতিহাসে উল্লেখ নাই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে লিখিত আছে,

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল গৌড় অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরি॥
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হইল।
সুবুদ্ধিরায়ের তিঁহ বহু বাড়াইল"॥ ইত্যাদি।

বোধ হয় ইহা পাঠ করিয়া লেখক সুবুদ্ধি রায়কে হুসেন সাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়াধিপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাসবিরুদ্ধ। তবে সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের কোন ধনবান ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং সেই সময়ে হুসেন সাহা তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন এইরূপ অবধারণ করিলে চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত প্রচলিত ইতিহাসের কোন বিরোধ হয় না।

লেখক অন্যত্র বলিতেছেন, "একখানি তুরকিনামা পারস্য ভাষার গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর দিল্লী হইতে গৌড়েশ্বরকে পারস্য ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, এক এক সময় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ হইত। * * গৌড়েশ্বর সেই সকল পত্রাদির উত্তর লিখিবার কারণ, মূলপত্রাদি গুণরাজ খাঁনের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গুণরাজ খাঁন আবার সেই সকল পত্রের উত্তর লিখিবার কারণ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের হস্তে দিতেন। পশ্চাৎ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কর্ত্তৃক লেখা প্রস্তুত

হইলে মন্ত্রীবর তাহা লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত করণান্তর রাজার অনুমতিক্রমে তাহাই সম্রাটের নিকট দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন। সেই সকল পত্রের "এবারত" অর্থাৎ রচনা এতই মধুর ও শ্রবণতৃপ্তিকর হইত যে, পাঠ ও শ্রবণ করিবার কালে দিল্লীশ্বর বড়ই প্রীত এবং বিস্মিত হইতেন। এবং লেখ্য দর্শন করিয়া একমুখে লেখক ও রচকের শত শত প্রশংসা করিতেন।"

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সৈয়দ হুসেন সাহা ১৪৮৯ খৃঃ-অব্দ হইতে ১৫১৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত গৌড়ের রাজা ছিলেন। এই সময়ে লোদী বংশীয়েরা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং চৈতন্যদেব হুসেন সাহার সমসাময়িক ছিলেন। আকবর এ সময় দিল্লীর সম্রাট থাকা দূরে থাকুক, তখন তিনি জন্মগ্রহণও করেন নাই। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর সাহ কর্ত্তৃক ভারতে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে আকবর জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লেখক বলিতেছেন যে, তাঁহার লিখিত বিবরণ "একখানি তুরকি-নামা পারস্য ভাষার গৌড় ইতিহাসে বর্ণিত আছে" ইত্যাদি। এই তুরকিনামার সম্বন্ধে লেখক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। ফলতঃ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া লেখাই কর্ত্তব্য। কেবল জনশ্রুতি ও "আষাঢ়ে গল্প" অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। লেখক মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত কোন্ বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা লিখিলে ভাল হইত। আক-বর সম্বন্ধে "ভক্তমাল" গ্রন্থে † লিখিত আছে, সনাতন জীবনের

† ভক্তমাল—বিংশতিমালা দেখ।

শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিতেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহ সেই সময়ে আগরা নগরে থাকিতেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর উৎকট বৈরাগ্য ও অসাধারণ মহত্ত্বের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে সনাতন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। লেখক একস্থানে বলিয়াছেন, সনাতন ১৪৮০ শকে বৃন্দাবনে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। (নব্যভারত মাঘ ৫২৮ পৃষ্ঠা) ইহা সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেও আকবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আকবর ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে (১৪৭৮ শকে) সম্রাট হয়েন, কিন্তু এই সময়ে তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। সুতরাং ১৪৮০ শকে তাঁহার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর। এত অল্প বয়সে তিনি যে সনাতনের সাধুতাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনার্থী হইবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় আরও কিছু দিন পরে—অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর বয়সের সময় আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সনাতনও অন্ততঃ ১৪৯০ শকাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে ভক্তমালের সহিত প্রচলিত ইতিহাসের কোন বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের বোধ হয়, লেখক মহাশয় ভক্তমাল অগ্রাহ্য করিয়া পারস্য গ্রন্থবিশেষ ও অমূলক জনপ্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

লেখক আবার বলিতেছেন, আকবর "এক সময়ে একটী পত্রের উত্তরে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে লেখক ও রচকের নাম জানিবার অভিপ্রায়ে গৌড়েশ্বরকে পত্র লেখেন। গৌড়েশ্বর সেই পত্র পাইয়া এবং অমাত্য গুণরাজ খাঁন প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া লেখক শ্রীরূপ ও রচক শ্রীসনাতন এই উভয় নাম পত্রাভ্যন্তরে লিখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন। দিল্লীশ্বর সেই উত্তর পাইয়া, শ্রীরূপ ও সনাতনকে মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত এবং মর্য্যাদার সহিত তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ ও বন্ধুভাবে গ্রহণ ও তাহাদের মন্ত্রণানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করণের নিমিত্ত "ফরমাণ"

অর্থাৎ নিজ আজ্ঞার সহিত শ্রীরূপ ও সনাতনের পৃথক পৃথক নামকরণে এক একখানি "পাঞ্জাপাট্টা" অর্থাৎ নিজ করপল্লব-যুক্ত সনন্দ লিখিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দেন।" আকবর রূপসনাতনের লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উভয়কে তৎক্ষণাৎ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার অকাট্য কারণস্বরূপ লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, "সম্রাট আকবর যথার্থ গুণী-লোকের আদর ও সম্মান করিতেন। লেখা ও রচনার ভাবে দিল্লীশ্বরের হৃদ্‌প্রত্যয় হইয়াছিল যে, লেখক ও রচক সামান্য ব্যক্তি নহেন। হয় দেব-অংশসম্ভূত, নয় ঈশ্বরের কৃপাভাজন পাত্র, অথবা সরস্বতীর বরপুত্র।" এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই।

লেখক আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীকুমার দেব নবহট্ট (নৈহট্ট) বাস পরিত্যাগে নিজপুত্র বহুবিদ্যাবিশারদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীবল্লভ, এই পুত্রতনয় এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধব সহিত গৌড় রাজধানীর নিকটস্থ রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।" কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, সনাতনের পিতা কুমার, জ্ঞাতিবর্গের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নৈহাটীর বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক বাকরগঞ্জ) গিয়া বাস করেন। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।* এই ফতোয়াবাদ গ্রামেই রূপসনাতন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ফতোয়াবাদ এখন যশোর জেলার অন্তর্গত। এখানে রূপসনাতনের অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন ও

---

* "জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতোয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয়॥"

ভক্তিরত্নাকর।

তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী সুপ্রশস্ত জলাশয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই প্রদেশে রূপসনাতনের সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাই যে সমধিক বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষার আদিকাব্য "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বসুর সম্বন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "কুলীন গ্রামনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীবসু রামানন্দ ও শ্রীসত্যরাজ খাঁনের পিতা মহাত্মা মালাধর বসু, উপাধি গুণরাজ খাঁন, যাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে গ্রন্থ বঙ্গের আদি গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ * * * সেই মহাত্মা মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন।" লেখক মালাধর বসুকে রামানন্দ ও সত্যরাজের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "সজ্জন-তোষণী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়, কুলীন গ্রামের বসু মহাশয়দের বাটী হইতে যে কুলজী আনিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, "ইহাঁর চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু উপাধি সত্যরাজ খাঁন। তস্যপুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু।" † সুতরাং রামানন্দ বসু মালাধরের পুত্র নহেন—পৌত্র।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন কি না তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" পাঠে তাহা জানা যায় না। গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক তিনি "গুণরাজ খাঁন" এই উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। লেখক মহাশয় এবিষয়ে কোন প্রমাণ উল্লেখ করিলে আমাদের সন্দেহ নিরাকৃত হইত।

সমালোচ্য প্রবন্ধে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমপ্রমাদ আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহার আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয় যদি পুনর্ব্বার লেখনীধারণ করতঃ আমাদের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের সন্দেহ দূরীকৃত করেন, তাহা হইলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব।

---

† শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের উপক্রমণিকা ৵০ পৃষ্ঠা।

সাধনা।

ভারতবর্ষে—জয়পুর।

লোকপূর্ণ চৌরাস্তার অপর ধারে, মন্দিরের সম্মুখে, মহারাজার বিদ্যালয় সমুত্থিত। বায়ু-মন্দিরের ন্যায় ইহারও অদ্ভুত গঠন ও রং গোলাপী; আমি দেখিয়া মনে মনে তারিফ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাকে আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল; তিনি একটা অন্ধকেরে ছোট ঘরে, রাশীকৃত কেতাবের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু মুখশ্রী অতি মধুর, অতি সুন্দর, একটু চিন্তান্বিত, সমস্ত মুখের গঠন বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির ন্যায় কৃশ ও উন্নতললাটসম্পন্ন; তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্যে সাদাসিধা একটি কালরঙ্গের লম্বা চাপ্‌কান মাত্র। অতি সংযত অঙ্গভঙ্গীর সহিত, খুব খাঁটি ইংরাজিতে দুইচারিটি স্বাগতোক্তি ব্যক্ত করিয়া আমাকে পাঠশালার মধ্যে লইয়া গেলেন। উচ্চ-শ্রেণী ছাত্রদিগের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহারা বাড়িতেই প্রস্তুত হইতেছে, কালেজে আইসে না—কেবল কালেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদিগকে দেখিলাম। স্তম্ভ-শোভিত বৃহৎ শালার মধ্যে, এক এক দল ছাত্র, এক একটি শিক্ষককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। চৌকি নাই, বেঞ্চ নাই, ডেস্ক নাই। আমরা প্রবেশ করিবামাত্র সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আগ্রহ ও ভদ্রতার সহিত অত্যন্ত অব-

নত ভাবে আমাদিগকে সেলাম করিল। কিন্তু পাঠশালার আর একটি কাম্‌রায় কতকগুলি ছাত্র দাঁড়াইল না—বসিয়া রহিল। প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই বিশেষ শ্রেণীটি কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র ও ওম্‌রাহদিগের পুত্রদিগের জন্য রক্ষিত। ইহারা বংশ-গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাই আমাদিগকে সেলাম করিল না।"

এখানকার সমস্ত অধ্যাপনা-কার্য্য সরকারী ব্যয়ে দেশীয় অধ্যাপকগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা রাজ-সরকারে কাজকর্ম্ম পাইয়া থাকে। এখানে অঙ্কশাস্ত্র, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা, পারস্যভাষা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বলিলেন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ও পালী ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ পারস্য ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। ষ্টুয়ার্ট মিল এবং স্পেন্সর রীতিমত পঠিত হয়। কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ বাঙ্গালী, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; দেখিলাম, ইংলণ্ডে এমন কি সমস্ত য়ুরোপে আজ কাল যাহা কিছু হইতেছে তিনি তদ্বিষয়ে সম্যক্‌ অভিজ্ঞ। তিনি ফরাসী পণ্ডিত বুর্ন্‌ফ্‌, বার্থেলেমি স্যাং হিলেয়ার, বেয়্‌গেইন্‌ এবং ফরাসী দেশীয় সংস্কৃতপণ্ডিতদিগের উল্লেখ করিয়া প্রভূত প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—"মোদ্দা কথা, য়ুরোপের বিষয় আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা ইংলণ্ডের ভিতর দিয়া। ছাত্র যুবকেরা উচ্চশিক্ষার শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া ইংরাজি প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করে। সেক্সপিয়ার, মিল্টন, (হিন্দু মস্তিষ্কের পক্ষে সুন্দর আরম্ভ) তৎপরে অ্যাডিসন, পোপ্‌—তাহার পর দর্শন ও বার্ত্তা-শাস্ত্রের গ্রন্থকার লক্‌, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ্‌, বর্ক, অষ্টাদশ ও উনবিংশতি শতাব্দীর লেখকগণ, স্পেন্সর

পর্য্যন্ত সমস্তই পঠিত হয়। ইহার মধ্যে স্পেন্‌সরের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে, ফরাসী ও জর্ম্মান লেখকদের রচনাসকল যাহা কিছু আমরা জানিতে পাই, তাহা মূল হইতে না—ইংরাজি অনুবাদ হইতে। সাধারণতঃ ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা আমরা প্রায় কেহই জানি না। কিন্তু আজকাল ইংলণ্ড ছাড়া অন্য দেশের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হেগেল, ফিথ্‌টের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নহি বটে, কিন্তু আমরা প্রাচ্য দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ উপনিষদ্‌ ও প্রাচীন বেদান্ত শাস্ত্র—উহার মধ্যেই স্পিনোজা, কাণ্ট্‌, হেগেল, সপেন্‌হয়ার সমস্তই একাধারে পাওয়া যায়।”.........

একটু একটু করিয়া তিনি ক্রমশঃ মাতিয়া উঠিলেন—ক্রমে দেখিলাম তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীনশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বলিলেন,“পাঁচ ছয় বৎসর হইতে,আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রের অনুকূলে স্রোত ফিরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে,ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, কলিকাতার লেখকেরা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দুর্নীতি ও অযৌক্তিকতার উল্লেখ করিয়া বিস্তর নিন্দা করিত। এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের অতিরঞ্জিত উক্তিসকলের মধ্যেও একটা গভীর তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। এখন আমাদের চিন্তাশীল লেখকেরা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের এখন এই উচ্চ আকাঙ্খাটি বলবতী হইয়াছে যে,আমরা আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি—আমাদের নিজস্ব ফিরিয়া পাই। দেখুন, মহারাজা এই ইংরাজী ব্যাপারসকল এখানে তো প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কালেজ, মিউজিয়ম্‌, শ্রমশিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছুই করেন না। তাঁহার “অম্বর” প্রাসাদে কালীদেবীর সম্মুখে ছাগ বলি হয়। আমরা সাঙ্কেতিক চিহ্নের মধ্যে উদ্দেশ্য দেখিতে পাই, অক্ষ-

রের মধ্যে অর্থ দেখিতে পাই—যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞ সাধারণের জন্য কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায় আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা বুদ্ধিমান বাঙ্গালার নব্য সম্প্রদায় যে ইংরাজী একেশ্বরবাদ এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই একেশ্বরবাদের প্রতিকূলে আজকাল উল্টা স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এখন বুঝিতেছি, উহা অপেক্ষা একটা গভীরতর তত্ত্বের আমরা অধিকারী এবং সেই তত্ত্বটি আমাদের দেশের নিজস্ব ধন। স্পেন্‌সরের লেখা আমরা যে পড়িতে ভালবাসি, তাহার অর্থ যে স্পেন্‌সরও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বিরোধী। তাঁহার মতে ঈশ্বরের সগুণ কল্পনা মানবীকরণের প্রকারান্তর মাত্র। তাঁহার মতে ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয়, এক, কিন্তু সেই এক হইতেই কল্পে কল্পে বিবিধ জীব ও সর্ব্বপ্রকার আকার ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, তাই তাঁহার লেখা আমাদের বেদান্তের ব্রহ্মকে অনেকটা স্মরণ করিয়া দেয়।"

এই হিন্দু যাহা বলিলেন তাহা কি সত্য? ভারতবর্ষ আত্মচেতনা লাভ করিয়া সত্যসত্যই কি ইংলণ্ডীয় জ্ঞান বুদ্ধির অধীনতা-যুগ আপনার স্কন্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে? সত্যসত্যই কি ভারতবর্ষ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় স্বকীয় মতকে ইংরাজী জাতীয় মতের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে? মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর মস্তিষ্ক অনেক দিন পর্য্যন্ত অসাড় হইয়াছিল, এখন কি ব্রিটানিয়ার শান্তি-ছায়ায় থাকিয়া সেই মস্তিষ্ক কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে? কোথা হইতে এইরূপ হইল? যাহা হউক এ বড় আশ্চর্য্য দৃশ্য—দুইটি বিপরীত সীমায় মানবজাতি পরস্পর মুখামুখী করিয়া অবস্থিত। এক দিকে উদ্যম, কার্য্যকরী ইচ্ছাশক্তি, ইংরাজী কেজোভাব, আর এক দিকে হিন্দুর চিন্তা-কল্পনা

—সেই দার্শনিক স্বপ্নদর্শনের প্রবণতা, যাহার প্রভাবে চিন্তা বিজয়ী হইয়া বাসনা ও মায়ার উপর প্রভুত্ব লাভ করে এবং মনের সমস্ত কার্য্যকরী প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

... ...

নেত্রের তৃপ্তি সাধন করিয়া, একাকী সেই আশ্চর্য্য গোলাপী রাস্তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া, বিচিত্রবর্ণের আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া, এই জয়পুরের অদ্ভুত কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া আজিকার দিনটা অতিবাহিত করিলাম। পরে, নগরের বাহিরে গিয়া যে পথটি অম্বরের দিকে গিয়াছে সেই পথটি অনুসরণ করিলাম। শুভ্র সুন্দর একটি কটিবন্ধের ন্যায় এই পথটি, ক্ষুদ্রতরু-প্রমাণ অদ্ভুত একপ্রকার হরিদ্বর্ণ ঘাসের মধ্যে দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ঘাস অনেকদূর পর্য্যন্ত ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই অচল কঠিন উদ্ভিজ্জ যেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহের বলিয়া মনে হয়। এই ঘাসের অরণ্যের অপর প্রান্ত হইতে, পুরাকালের ইমারৎ-সকল—শত শত অট্টালিকা, শত শত মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির উজ্জল সূর্য্যরশ্মির মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জলিতেছে। লাল ও নীল পরিচ্ছদভূষিত নরনারীর দল আনন্দ-মনে চলিয়াছে। এত ময়ূরের ঝাঁক্ আমি কখনও দেখি নাই—আর, এমন সুন্দর ময়ূর। পথের মধ্যেই ময়ূরেরা বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের মণিময় পাখা সূর্য্যালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। এই ময়ূরেরা মুক্ত অথচ পোষা, ইহারা কাহারও সম্পত্তি নহে এবং বিশ্বস্ত ভাবে লোকের মধ্যে বাস করিতেছে। সকল প্রকার নিরীহ জীবজন্তু হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র; ময়ূরও এই কারণে হিন্দুদিগের সেব্য—তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দেওয়া লোকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। আমার ভৃত্য ছেদিলাল, আমাকে গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই ময়ূরেরা কাহারও কিছু

হানি করে না, কিন্তু ইংরাজেরা এমনি দুষ্ট, ইহাদিগকে পাথর ছুঁড়িয়া মারে।"

আরও দূরে, একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ, বুনো ঘাসে সবুজ হইয়া গিয়াছে—মনে হয় যেন উহা একটি প্রকাণ্ড সরসীর আর্শিতলে প্রতিষ্ঠিত। ইহার কালো বিষাক্ত জল অল্প অল্প ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। ইহার তটদেশে কুম্ভীরেরা স্থির ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। চারিদিকে সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল পর্ব্বত-শ্রেণী আলোকে পরিপূর্ণ এবং প্রশান্ত নীল গগনকে বেষ্টন করিয়া আছে। সূর্য্যের মৃদু উত্তাপ, বায়ু সূক্ষ্ম, লঘু, সুখস্পর্শ এবং একটু মাদকতা-বিশিষ্ট।... ...

তাড়াতাড়ি আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। আস্তাবলে শত শত আরব ঘোড়া পদাস্ফালন করিতেছে, কুক্কুর-গৃহে শিকারী কুক্কুর সকল রহিয়াছে, হাতিশালায় হাতিরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, উদ্ভিজ্জ-মণ্ডপে বিবিধ উদ্ভিজ্জ রক্ষিত। এইবার গোলাপী নগরের নিকট বিদায় লইয়া যাইতে হইতেছে। ষ্টেসনের নিকটে, হিন্দুস্থানী পুস্তকরাশির ভারে ভারাক্রান্ত একটি অল্পবয়স্ক রাজপুত ছাত্র আমাকে মধুর ভাবে "গুড্ আফটরনুন্" বলিয়া অভিবাদন করিল।

য়ুরোপীয় সাজসজ্জায় বেষ্টিত রেল-গাড়িতে আবার যখন উঠিলাম, তখন মনে হইল যেন এমন একটি উন্মত্তকারী রঙ্গালয় হইতে বহির্গত হইলাম যেখানকার নাট্য-দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইতে হয়, যেখানে সেক্সপিয়রের কমেডির ন্যায় কিম্বা ওয়াটোর প্যাষ্টোরালের ন্যায় বাস্তবকে ভুলিয়া যাইতে হয়। এই পিতৃ-শাসিত জনসমাজ, এই সকল গোত্র, এই সকল সূর্য্যবংশীয় অশ্বারোহী রাজপুত ঠাকুরের দল, এই সুবিজ্ঞ রাজা যাঁহাকে প্রজারা ভালবাসে, যিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী*

* তাহার দৃষ্টান্ত, রাজার অনুমতি ব্যতীত জয়পুরে ফোটোগ্রাফ্ তোলা যায় না।

পিতৃস্থানীয়; ঢালবল্লমধারী এই সকল যোদ্ধৃগণ, ইহাদের অদ্ভুত শ্মশ্রুরাজি, ইহাদের সৌখীন পরিচ্ছদ, রাস্তার হাস্যময় সুখী লোকজন, নীলরঙ্গের কুকুর, শিকারী নেক্‌ড়ে বাঘ—এই সমস্তই গীতিনাট্যের জগৎ—স্বপ্নজগৎ। কর-মর্দ্দিত ষ্ট্রবেরিফলের রং, গোলাপী রঙ্গের বাড়ীসকল যাহা পাথরের বলিয়া মনে হয় না, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বুরুজ-শোভিত দুর্গ-নিবাস, অদ্ভুত লঘু-ধরণের ইমারৎসকল, 'সূর্য্যের মন্দির' 'বায়ুর প্রাসাদ' 'মেঘের প্রাসাদ,' 'পান্নার দ্বার,' "শোভার শালা" বাষ্পবৎ লঘু পর্ণ-জাতীয় (Fern) উদ্ভিজ্জ-পরিপূর্ণ উদ্ভিজ্জ-মণ্ডপ, ঘাসে পরিপূর্ণ মাঠ, ঝোপ-নিবাসী নীলকণ্ঠ ময়ূর, কৃষ্ণসলিলা সরসীশোভিত পরিত্যক্ত প্রাসাদ-মন্দির—এই সমস্ত গীতিনাটের দৃশ্যাবলী। এখানকার জীবনযাত্রাও গীতিনাট্যের উপযুক্ত। এখানে কোনও দায়িত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য্য নাই, কোনও গুরুতা নাই, দুঃখকষ্টের কোনও ভাব নাই—এই হাস্যময় শিল্পীজাতির আর কোনও কাজ নাই—আর কোনও ভাবনা নাই; ইহারা কেবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি পশুমূর্ত্তি গড়িতেছে, জরির জুতা তৈয়ারি করিতেছে, গৃহ-প্রাচীর নীল রঙ্গের ছবির দ্বারা চিত্রিত করিতেছে, সুন্দর আরব ঘোড়ায় সওয়ার হইতেছে, আকাশের পক্ষিদিগকে পোষণ করিতেছে, ঘুড়ি উড়াইতেছে এবং বিশ্বস্তচিত্তে মুক্ত আলোকে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হাঁ! ইহাদের জীবন সাদাসিধা, সুখী, শিশু-প্রায়—ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতের বিরাম নাই—আনন্দের বিরাম নাই। আমাদের দুঃখময় তমোময় য়ুরোপে ফিরিয়া যাইবার সময় আমি এই সমুজ্জল কবিতাময় স্বপ্নটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

স্বরলিপি।

ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

কে এলো, কে এলো,
সে আর কে এলো।
ওই দেখ, পূর্ব্ব গগনে তরুণ অরুণ কিরণ ছায়,
বিহঙ্গম কুঞ্জে কুঞ্জে গায়,
চল, সখি চল।
একে একে সব তারা নিভিল,
ম্লান শশি অস্তে গেল,
কে সে এলো
কে সে এলো
সাধের মালা শুকালো, শুকালো॥

১ ২´ ৩ ০ ॥
গা ॥ মা পমগা। গা ঋা। সা সঞ্‌্ৰ্। সঞ্‌্ৰ্ দ্‌দা।
কে॥ এ লো। কে, এ। লো, সে। আর কে।

১ ২´ ৩ ০ ১
। সঞ্‌্ৰ্ সা। সমা মসা। গা মা। পদা ঞদা। পপা দা।
। এ লো। ওই দেখ। পূ র্ব্ব। গগ নে। তরু ণ।

২´ ৩ ০ ১
। পমা মপগা। গমপা মমা। গঋা -সা। -গা -া।
। অরু ণ। কি রণ। ছা —। — য়।

২´ ৩ ০ ১ ২´
। সা র্সা। -া ঞঞা। ঞদা পা। পদা ঞদপা। পদপা -মপমা।
। বি হ। — ঙ্গম। কু ঞ্জে। কু ঞ্জে। গা য়।

৩ ০ ১
। মগা গগা। গমঃসঃ গা ॥ দা দা। ঞা র্সা। র্সঞা র্সা।
। চল সখি। চল কৈ ॥ এ কে। এ কে। স ব।

। ঞা র্সঞা। র্সা ঞদা। দা -ঞদা। -পা -দপা। -মা -পমা।
। তা রা। নি ভি। ল —। — —। — —।

। -গা গা। মা -ঞদা। র্সঞা র্সা। র্সা র্গর্সা। র্স র্ঞর্সা।
। — ম্লা। ন —। শ শি। অ স্তে। গে ল।

। ঞদা পা। দপা মপা। গা মগা। ঋসা সা। সঋা গমা।
। কৈ সে। জ লো। কৈ সে। এ লো। না ধের।

। ঞদা -ঞা। -ঋ র্সা। -ঋ র্সা। র্ঞর্সা ঞদা। পমা মগা।
। মা —। — লা। — শু। কা লো। শু কা।

০
। সা গা ॥
। লো কৈ ॥

ব্যাখ্যা।

১। ঞ=কোমল নি; দ=কোমল ধা; ঋ=কোমল রি।
২। বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

ভ্রম সংশোধন।

গত মাসের সাধনায় প্রকাশিত স্বরলিপির মধ্যে প্রথম পংক্তিতে "নর্র। সা" (আ মা) না হইয়া "নর্র। সা" (আ মা) হইবে। ষষ্ঠ পংক্তিতে "ধনা না" (প ড়ে) না হইয়া "ধনা র্সা" (প ড়ে) হইবে। এবং নবম পংক্তিতে "সা র্সা" (শ্রা ব) না হইয়া "সা সা" (শ্রা ব) হইবে।

সাংখ্যদর্শন।

২২॥ সাংখ্যদর্শনের "ইন্দ্রিয়"॥

এতদ্দেশীয় দার্শনিকেরা বলেন ইন্দ্রিয় একাদশ প্রকার। চক্ষু কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পানি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর মন উভয়াত্মক মিশ্র ইন্দ্রিয়।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি?

ভাষা কথার ইন্দ্রিয় ও সাংখ্যদর্শনের ইন্দ্রিয় এক নহে। মস্তক-নিহিত গোলকদ্বয়কে সাংখ্যেরা চক্ষুরিন্দ্রিয় বলেন না; বিধৃত-লেখনী অস্থিমাংসকে তাঁহারা "পানি" নামক ইন্দ্রিয় বলেন না; কিম্বা মস্তক-মধ্যস্থিত মজ্জাকে তাঁহারা মন বলেন না।

সাংখ্যেরা বলেন—

"অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ং; ভ্রান্তানাম্ অধিষ্ঠানে"॥ ২।২৩॥

যাহা দর্শনশাস্ত্রসম্মত "ইন্দ্রিয়" তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। যাহারা অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানকে "ইন্দ্রিয়" বলে তাহারা ভ্রান্ত।

ইন্দ্রিয় শব্দের সাংখ্যদর্শনসম্মত অর্থ আত্মার শক্তি। যে শক্তি থাকাতে আত্মা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, তর্ক করিতে পারে, হস্ত পদাদি সঞ্চালনরূপ প্রকৃতির গতি উৎপাদন করিতে পারে তাহাই আত্মার "ইন্দ্রিয়"।

যদি তাহাই হয়, তবে একাদশ ইন্দ্রিয় স্বীকারের প্রয়োজন কি? একমাত্র "শক্তি" নামক পদার্থ স্বীকার করিলেই ত হয়? এস্থলে সাংখ্যেরা বলেন;—

"শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ ন একত্বম্"॥ ২।২৪॥

না; কেন না একমাত্র ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার করিয়া তাহারই

ভেদ বলিলে—ফলে ইন্দ্রিয়ের ভেদ অঙ্গীকার করা হইল—প্রকৃত ইন্দ্রিয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইল না। ভাষ্যকার এস্থলে বলেন—

"একস্য এব ইন্দ্রিয়স্য শক্তিভেদস্বীকারেঽপি ইন্দ্রিয়ভেদঃ সিধ্যতি। শক্তীনামপি ইন্দ্রিয়ত্বাৎ। অতঃ ন একত্বম্ ইন্দ্রিয়স্য ইত্যর্থঃ"।

এস্থানে "শক্তীনামপি" না লিখিয়া "শক্তীনামেব" লেখা উচিত ছিল। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে "শক্তির"ই নাম ইন্দ্রিয়। যদি শক্তির ভেদ স্বীকার কর তবে ইন্দ্রিয়েরই ভেদ স্বীকার করা হইল।

অতএব দেখা যায় সাংখ্য মতে আত্মার কতকগুলি অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে; তাহার দ্বারা দর্শন শ্রবণ আদি জ্ঞান; স্মরণ চিন্তন ভালবাসা রাগকরা ইত্যাদি "মনন"; একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ আদি ক্রিয়া-করণ সংসাধিত হয়।

শক্তি=ইন্দ্রিয়; অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তি=অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়। কথাটা কেমন খাপছাড়া বোধ হয় না? "অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্"—এ কেমন কথা? এস্থলে "অতীন্দ্রিয়" শব্দ প্রচলিত অর্থ "অপ্রত্যক্ষ" এই মাত্র বুঝিলে আর কোন গোলোযোগ নাই। যে পদার্থ যাহা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার জ্ঞানকে "প্রত্যক্ষ" বলা যায়। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে ইন্দ্রিয় "অপ্রত্যক্ষ" বলিলে ইন্দ্রিয় একবারে জ্ঞানের অগোচর। আমাদের যে দর্শনাদি শক্তি আছে—তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি; কিন্তু যে অর্থে গোলাপ ফুলকে "দেখা" যায় সে অর্থে তাদৃশ শক্তিকে "দেখা যায় না"।

অবিবেচক লোকে যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে—সাংখ্যেরা তাহাকে কেবল "ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান" বলেন। সাংখ্যেরা যাহাকে ইন্দ্রিয় বলেন সাধারণ লোকে তাহা বুঝে কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের সহিত ইন্দ্রিয়ের কি সম্বন্ধ ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটি অতি

জটিল প্রশ্ন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সম্বন্ধ আমরা প্রত্যেকে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াও তাহা ভাষাতে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি বেশ অনুভব করিতেছি সে সম্বন্ধ কি—কিন্তু তোমাকে বুঝাইতে গেলেই বিপদ! এই সম্বন্ধের বিষয়ে বলা যাইতে পারে।

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ"॥

ইহার কারণ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ভাষার অসম্পূর্ণতা। এই সম্বন্ধের তত্ত্ব ভাষায় বুঝাইতে গেলে নূতন ভাষা সঙ্কলন করিতে হয়। আমাদের প্রচলিত খাওয়া-পরার ভাষাতে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকটন করা অসাধ্য।

॥ ২৩ ॥ সাংখ্যদর্শনের কার্য্যকারণ তত্ত্ব ॥

সাংখ্যেরা বলেন—

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ॥ ১।১১৪।

অর্থাৎ যেমন মনুষ্যের শৃঙ্গ উঠে না—তেমনি যাহা ছিল না তাহা কদাচ উৎপন্ন হয় না।

অপিচ—

নাশঃ কারণলয়ঃ। ১। ১২১।

যখন কোনও পদার্থ বিনষ্ট হয়—তখন তাহার কারণে লীন হয় মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোনও পদার্থই নষ্ট হয় না। অর্থাৎ আমাদের এই সংসারে দ্রব্যের উৎপত্তিও নাই—দ্রব্যের বিনাশও নাই। যাহাকে তোমরা বল উৎপত্তি তাহা আবির্ভাব মাত্র। সত্ত্ব রজস্ তমস্ নামক পদার্থপুঞ্জ—চিরকালই আছে চিরকালই থাকিবে।

একটা কলসীকে ভাঙ্গিয়া ফেল তাহা পূর্ব্বে যে মৃত্তিকা ছিল সেই মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে। কামনার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায় আমাদের এই সংসারের আবির্ভাব তিরোভাব হয়। যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কারণ বলি তাহা সেই পদার্থের পূর্ব্বতন অবস্থাবিশেষ মাত্র; যাহাকে আমরা কোনও পদার্থের কার্য্য বলি তাহা সেই পদার্থের পরবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ মাত্র। সংসারে একটি কথাও হইতেছে না বা সংসার হইতে একটি কথাও যাইতেছে না। সংসারে নিত্যবস্তু অনেক হয় আর তাহাদের অন্যোন্যাভিভব ও অন্যোন্যাশ্রয় জন্য সর্ব্বদাই সংসারের আকার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু কোন বস্তুরই কণামাত্র বিলুপ্ত হইতেছে না।

সাংখ্যদর্শনের এইটি একটি বিশিষ্ট যুক্তি। তাঁহারা এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ঘোষণা করেন প্রকৃতি আদ্যন্তবিহীনা—পুরুষও আদ্যন্তবিহীন। ইহারা যেমন সৃষ্টির অযোগ্য তেমনি বিনাশেরও অযোগ্য।

॥ ২৪ ॥ সাংখ্যেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিতণ্ডা স্থলে কি বলেন কি বা না বলেন ॥

অতঃপর বোধ হয় সাংখ্যদর্শনের কথায় সাধনায় পাঠকবৃন্দ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন—এক কথা আর কতদিন ভাল লাগে? আমার মনে হইতেছে যে এক্ষণে এই প্রবন্ধমালার উপসংহার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আর দুই একটি কথায় পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি।

এই নশ্বর সংসারে আমাদের কাহারো—জ্ঞানপিপাসা কি ভোগলালসা—মিটিতেছে না। আমরা সকলেই জানি দুই এক দিন বাদে মৃত্যু নামক এক ঘোরতর অবস্থাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। আমরা সেই অতৃপ্ত পিপাসা ও লালসা লইয়াই কি মরিব? মরিবার পর

কি আর আমাদের ভোগ নাই জ্ঞান নাই? আমরা সকলেই এই চিন্তায় জর্জরিত। যাহাকে আমরা দেহ বলি—তাহাই যদি আমাদের ষোল আনা হয় তবে ত আমাদের মত হতভাগ্য জীব আর নাই! মনুষ্য এই চিন্তায় অধীর হইয়া দেহব্যতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ইহার তর্কে প্রবৃত্ত হয়। আত্মা কি?—চেতনাময়-সুখময়-দুঃখময়-বাঞ্ছাময়-ইচ্ছাময় একটা জিনিষ। দেহ কি? - রূপরসগন্ধস্পর্শময় অচেতন একটা জিনিষ। আত্মা আছে—ইহার প্রমাণ কি?—জ্ঞান। দেহ আছে ইহার প্রমাণ কি? তাহাও জ্ঞান। বাঃ—এ ত বড় বিচিত্র কথা! জ্ঞানে কি প্রমাণ করে?—জ্ঞান কি জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও পদার্থেরই প্রমাণ হইতে পারে? যখন জ্ঞান হইতেছে—তখন অবশ্যই জ্ঞান আছে—কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু আছে তাহার প্রমাণ কি?——

এইস্থানে পৌছিয়া কেহ কেহ বলিয়া বসেন—সংসারটা একটা বিচিত্র রঙ্গ তামাসার জায়গা—দেহও নাই—আত্মাও নাই; আছে কেবল জ্ঞান—জ্ঞান—জ্ঞান; অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্রোতের নাম সংসার।

সাংখ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—না না; জ্ঞানে যেমন জ্ঞান প্রমাণ হয় তেমনি ক্ষণিক ও ধারাবাহিক জ্ঞানরাশির আধারভূত "বিজ্ঞাতা" আত্মারও প্রমাণ হয়।

তবে জগৎসংসার আছে—না জগৎসংসার নাই?—এ প্রশ্ন স্থূলদৃষ্টি লোকের নিকট করিলে তাহাদের কেবল অবাক্ হইবারই কথা। কিন্তু জগৎসংসার আছে কিনা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদের বিজ্ঞান-জীবনের এক অবস্থায় তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই অবস্থায় অনেক পণ্ডিতে জগৎসংসারই নাই বলিয়া বসেন।

মহামতি কপিল জগৎকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া বিভিন্ন করিয়া বিজ্ঞানের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যক্ত জগৎ স্থায়ী ভাবে নাই, অব্যক্ত জগৎ স্থায়ী ভাবে আছে। জ্ঞানের দুই কোটি —এক কোটিতে বিজ্ঞাতার স্বতঃপ্রামাণ্য, অপর কোটিতে বিজ্ঞাতের স্বতঃপ্রামাণ্য। "জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ"—জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেও তাহার চরম বিশ্লেষণ এইরূপ। অতএব সাংখ্যদর্শনে বৈজ্ঞানিক নাস্তিবাদ নিরস্ত করে।

তাহার পর বৈজ্ঞানিকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। একদল মায়াবাদী—একদল জড়বাদী। কেহ বলেন জড় আত্মার কার্য্য, কেহ বলেন আত্মা জড়ের কার্য্য। সাংখ্যেরা এই দুই সম্প্রদায়কেই ভ্রান্ত বলেন। তাঁহারা বলেন জড়ও আত্মার কার্য্য নয় আত্মাও জড়ের কার্য্য নহে। আমাদের জ্ঞানের যতদূর সীমা—ততদূর আমরা উভয়কেই পৃথক্ দেখি। আমরা কৃত্রিম মনুষ্যও গড়িতে পারি না এবং কৃত্রিম মৃত্তিকাও গড়িতে পারি না।

দর্শন শাস্ত্রের যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর দেখা যায় জড়ও স্বাধীন আত্মাও স্বাধীন। উভয়ে জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ মাত্র। কিন্তু সেই সম্বন্ধের বিশ্লেষণ ঘটিলেও তাহাদের বিনাশের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের ধ্বংস হইলেও আত্মার চৈতন্য বা জড়ের অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়ত্বের ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে স্বাধীন নিত্য পদার্থ যে কদাচ বিনষ্ট হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

গত মাসের সাধনায় "অতিপ্রাকৃত" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বহিঃপ্রকৃতি অথবা জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানব মনেরই সৃষ্ট—এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।" ইহা প্রাচীন যোগা-

চার নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ নাস্তিবাদ। কপিল ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। কপিল অদ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থানীয় হইলে লিখিতেন :—

"ব্যক্ত জগৎ—সর্ব্বতোভাবে মানব মন ও জড় প্রকৃতির জ্ঞ-জ্ঞেয় সম্বন্ধবশাৎ সৃষ্ট এ কথাটা আমরা যখন তখন ভুলিয়া যাই।" *

ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখিয়াছেন—

"জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে—অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী, নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।" এই "সেই জন্য" নামক বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যাপারটা কপিলশিষ্যেরা জ্ঞানগম্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অগ্নি দাহ করিলে আমরা জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে দেখিয়া অতঃপর অগ্নি নিত্য নিত্য দাহ করুক বলিয়া কি আমরা অগ্নিতে দাহিকা শক্তি অর্পণ করিয়াছি? সেই শক্তি অর্পিত হওয়ার পূর্ব্বে অগ্নি দাহ করিয়াছিল কিরূপে? ফলতঃ আমার মূল বক্তব্য এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতদের দর্শন—সাংখ্যদর্শন নহে।— সাংখ্যদর্শন জড়ের অপলাপ করে না—আত্মারও অপলাপ করে না।

যাঁহারা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের বিভীষিকাগ্রস্ত তাঁহারা সাংখ্যদর্শন পাঠে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারেন।

কিন্তু প্রধান কথা এই সাংখ্যদর্শন অনুসারে জীবনের লক্ষ্য কি? বাঁচিয়া আমাদের কি লাভ? সাংখ্যেরা বলেন—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥ ১।১।

---

* ত্রিবেদী মহাশয় যখন আমার এই লেখা পড়িবেন তখন ভরসা করি স্বীকার করিবেন যে এই লেখারূপ বাহ্য জগৎটা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনের সৃষ্ট নহে।

মনুষ্য নানাবিধ ক্লেশে যে কষ্ট পায় তাহার এককালীন সম্পূর্ণ অবসানই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের মোক্ষ। ক্ষুধা পাইলে আহার করিলাম—রোগ হইলে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিলাম; ইহাতে সাংখ্যের মন পরিতুষ্ট নহে। কিরূপে একেবারে ক্ষুধা না পায়, কিরূপে একেবারে রোগ না হয়—সাংখ্য ইহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কি সম্ভব? সাংখ্য বলেন হাঁ; আমার যুক্তি শ্রবণ কর। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। এই দুইয়ের একটা অস্বাভাবিক সংযোগে রূপরসাত্মক ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়। সেই ব্যক্ত জগতে সুখ ও দুঃখ নামক দুইটা সামগ্রী দেখা যায়। তোমাদের যতকিছু দুঃখ সেই রূপরসাদির অনুভবসাপেক্ষ। যদি সেই রূপরসাদিরই অনুভব না হয়—তাহা হইলে তদপেক্ষিত সুখদুঃখের অনুভবের সম্ভাবনা কি? অতএব প্রকৃতিপুরুষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলেই দুঃখেরও অত্যন্ত অবসান হইবে।

ইহার কি অর্থ এই যে, মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য? মরিলে ত প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ ঘুচিতে পারে?

এইখানেই গোল। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতিপুরুষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিরূপে সংসাধিত হইল—তাহা আমরা অবগত নহি। সুতরাং মরিলেও যে সেই সম্বন্ধ ঘুচিবে তাহার প্রমাণ কি? স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার একটী সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর থাকা সম্ভব। তবে উপায়?

সাংখ্যেরা বলেন আত্মা যে অবস্থায় দুঃখ অনুভব করে তাহার নাম "বদ্ধভাব"। যে অবস্থায় দুঃখ অনুভব অসম্ভব তাহার নাম "মুক্ত ভাব"—"মোক্ষ" বা "মুক্তি"। আত্মা যদি স্বভাবতঃ "বদ্ধ" হয় তবে মুক্তি অসম্ভব।

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ। স্বভাবস্য অনপায়িত্বাৎ অনন্মুষ্ঠানলক্ষণম্ অপ্রামাণ্যং স্যাৎ।" ১। ৭—৮।

মুক্তিবিষয় শাস্ত্রও তাহা হইলে অনমুষ্ঠেয়তা দোষে দূষিত হইবে। কিন্তু আত্মা স্বভাবতঃ "বদ্ধ" নয়।

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগঃ তদ্যোগাৎ ঋতে।"—১। ১৯

আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত। দুঃখের সহিত যোগ কেবল প্রকৃতির সহিত যোগজন্য। অনেক বিচারের পর সাংখ্যেরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন—যে, "অবিবেক" বা প্রকৃতি পুরুষ যে ভিন্ন এই জ্ঞানের অভাব বশতই আত্মা বদ্ধভাবাপন্ন হয়। দেহকে যতদিন মনুষ্য আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত হয় ততদিন দুঃখ পায়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দেহ ও আত্মা ভিন্ন বুঝিলেই কি আমাদের দুঃখের অবসান হইবে? তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন, তা কিরূপে সম্ভব?

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদ্ অপরোক্ষাদ্ ঋতে"। ১। ৫৯।

যখন কাহারও একবার দিক্‌ভ্রম হয় সে উত্তরকে দক্ষিণ ভাবে—হাজার তাহাকে উত্তর বল—হাজার সে বুঝুক যে, ইহা উত্তর বটে, তবু তাহার দক্ষিণত্ব প্রতীয়মান যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ প্রতিপন্ন করিলেও তাহা সেই যেমন চিরকাল থালাথানার মত দেখা অভ্যাস তেমনিই দেখা যায়। তেমনি কেবল যুক্তির দ্বারা দেহ আত্মার ভেদ উপলব্ধি করিলেও দুঃখের অবসান নাই। কিন্তু তাহার পরেও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

অতএব মুক্তির জন্য বিবেক-সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন। দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর তপস্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমাধি বা ধ্যানের দ্বারায় বিবেকসাক্ষাৎকার হয়। যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি এক প্রকার,

আর সাক্ষাৎকার দ্বারা উপলব্ধি আর এক প্রকার। দিঙ্মূঢ় ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা দক্ষিণকে দক্ষিণ বুঝিলেও—কিয়ৎকাল তাহাকে উত্তর বলিয়া পরিগ্রহ করিতে থাকে। অবশেষে হঠাৎ কোনও সময়ে তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়া দক্ষিণকে দক্ষিণ বলিয়া সাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয়। যখন দেহ আত্মা ভেদ সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ "সাক্ষাৎকার"সংক্রান্ত জ্ঞান হয়—তখনই আমাদের দুঃখের অবসান সম্ভব। তপস্যাযুক্ত ধ্যানই এই অবসানের উপায়।* ইহা হইতেই তপস্যাযুক্ত যোগাভ্যাসের উৎপত্তি।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে সাংখ্যদর্শন এস্থলে দর্শনের সীমা ছাড়াইয়া কল্পনার সীমায় গিয়া পড়িয়াছে। একশত বৎসর তপস্যা করিলেও আমাদের ক্ষুৎপিপাসা বা শীতাতপের ক্লেশের যে অবসান হইবে তাহার প্রমাণ নাই। কপিল অবিবেকী ব্যক্তিকে "অবুদ্ধ"—ও সাক্ষাৎকৃত-বিবেক ব্যক্তিকে "বুদ্ধ" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন। আত্মা স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" বলিয়া তিনি খ্যাপন করেন। আত্মার এই স্বাভাবিক অবস্থা কোনও কারণে বিকৃত হওয়ায় আমরা "অবুদ্ধ" হইয়াছি। কিরূপে সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহার মতে তাহাই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তাঁহার উপদেশে মোহিত হইয়া অনেকে তপস্যা দ্বারা "বুদ্ধ" হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে ভণ্ডের অভাব নাই।—কিন্তু সিদ্ধার্থ গৌতম নামক এক নিরতিশয় সত্যপ্রিয় অমায়িক মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়া সংসারে প্রচার করিলেন—যে, তপস্যাতে যাতনার ও ক্লেশের অবসান না হইয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক পক্ষে সিদ্ধার্থও কপিলের যুক্তির ঘোরে থাকিয়া গেলেন। আত্মা

---

* উত্তাপে থাকিয়াও যখন উত্তাপ বোধ হয় না—অথচ চৈতন্য বিদ্যমান তখনই বিবেক-সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলা যায়।

যে স্বভাবতঃ "বুদ্ধ" ও মুক্ত,—বুদ্ধ হইলেই যে মুক্ত হওয়া যায় এ সংস্কার তাঁহার থাকিয়া গেল।—তবে তাঁহার মনে হইল যে "তৃষ্ণার" নির্ব্বাণ হইলেই—অর্থাৎ সংসারে ভোগবাসনার বিলোপ হইলেই বুদ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হওয়া যায়—এবং মনুষ্য মুক্ত হয়। তিনি রাজপুত্র হইয়াও রাজ্যত্যাগ করিলে তাঁহার যে তৃষ্ণার নির্ব্বাণ হই-য়াছে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। অতএব তিনিই সংসারে প্রথম "বুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; এবং কপিল যাহাকে মোক্ষ বলিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ব্বাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর কিরূপে সুখদুঃখের হাত এড়াইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যময় হওয়া যায়—কিরূপে "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব" পুনর্লাভ্ করা যায়—তাহাই কিছুকাল মানবজীবনের লক্ষ্য হইল।

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব কি না ইহা দর্শন-শাস্ত্রের অতীত কথা। ঋষিবর সোমযাগের দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ সম্ভাবনার উপদেশ দিতেন—কপিল তাহার বিরোধী হইয়া তপস্যার পন্থা প্রচার করেন। তিনি বলিলেন "দীর্ঘকাল শীতাতপের মধ্যে, ক্ষুৎপিপাসার মধ্যে, আমার বিবেক-মার্গের অনুশীলন কর—আত্মা যে দুঃখের অতীত কঠোর দুঃখের কারণের মধ্যে থাকিয়া তাহার সাক্ষাৎ-কারের চেষ্টা কর—যাহা যুক্তি দ্বারা বুঝিলে তাহা অনুভব কর—তখন চিরকালের জন্য দুঃখের অবসান হইবে।" সিদ্ধার্থ দেখিলেন তাহা ঠিক নয়। তিনি বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। কিন্তু মনু এপর্য্যন্ত কোনও মনুষ্যকেই দুঃখের পারগামী দেখিলেন না।

নব্য দর্শনশাস্ত্র হইতে "স্বর্গ" "মোক্ষ" বা "নির্ব্বাণ" শব্দকে দূরীভূত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের সীমায় মনুষ্যকে সুখদুঃখের অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। বুদ্ধ ও কপিল উভয়েই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রের সীমার

মধ্যে আশা ও আশ্বাসের সমাচার এই যে, প্রকৃতিপুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে কেহই অন্যের দাস নহে। প্রকৃতির দাসত্বে আমাদের ক্ষুৎপিপাসা ও রোগ ও জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে—কিন্তু প্রকৃতি আমাদের এতটুকু আয়ত্তাধীন যে, আমরা যত্ন করিলে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে পারি—বুঝিয়া চলিতে পারিলে রোগের হস্ত অনেক এড়াইতে পারি—অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুও এড়াইতে পারি। জরা মৃত্যু অপরিহার্য্য বটে—কিন্তু জরার পূর্ব্বে জীবন নিতান্ত মন্দ নয়। প্রকৃতির রূপও মনোহর এবং অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময়; সেইরূপ দর্শনের শক্তি যে আমাদের হইয়াছে ইহাও অল্প লাভের বিষয় নহে। কিসে দুঃখের অপচয় ও সুখের উপায় হইবে, দর্শনশাস্ত্র সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে আমাদিগকে উপদেশ দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়!" অভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রও জীবনসংগ্রামের মধ্যে মনুষ্যকে বলে—"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ মানব!" কপিলের দর্শন—সিদ্ধার্থ গৌতমের দর্শন এস্থলে উভয়েই ভ্রান্ত; উভয়েই মনুষ্যের বীরত্বের হানিজনক; ক্লীব্ ভাবের উৎপাদক। * কপিলের তপস্যা বা যোগপন্থা, বুদ্ধের বৈরাগ্যপন্থা, উভয়েই মনুষ্যকে বিপথগামী করে। তদপেক্ষা প্রাচীন ঋষিরা যে বলিতেন—

"জীবনং খলু সংগ্রামো বৃত্রহা তত্রবেশ্বরঃ।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥"

ইহাতেই বরং মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায়। জীবনের আততায়ী শীতাতপের বেশেই সমাগত হউক, ম্যালেরিয়া জ্বরের

---

* ব্রাহ্মণেরা সেই জন্যই কাপিল দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন তুল্য হেয় বোধ করেন। তাহারা বলেন "সাংখ্যশাস্ত্রমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।"

বেশেই আগত হউক, কিম্বা আক্রমণকারী কসাক সৈন্যরূপেই আগত হউক, তাহার সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত কৃষক ও সিপাহী সহজ বুদ্ধির প্রভাবে এ বিষয়ে কপিল ও সিদ্ধার্থ অপেক্ষা সুপণ্ডিত সন্দেহ নাই। ইন্দ্রই আমাদের যথার্থ উপাস্য দেবতা।

রাজসিংহ।

(নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)

চষা মাঠের মাঝখানে ভাঙ্গা পথ বাহিয়া পাল্কী চড়িয়া চলিতে চলিতে বঙ্কিম বাবুর নূতন সংস্করণ রাজসিংহ পড়িতেছিলাম। নব বসন্তের আতপ্ত মধ্যাহ্নবায়ু উদ্দাম কৌতূহলভরে মাঠের অপরপ্রান্ত হইতে হুহুঃ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অকস্মাৎ এই অলক-অঞ্চল-বিরহিত চাপকানপরিহিত অধ্যয়নরত পুরুষমূর্ত্তি দেখিবামাত্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে অবজ্ঞা ও নৈরাশ্য প্রকাশপূর্ব্বক পাল্কীর অপর দ্বার দিয়া ক্ষিপ্রবেগে নিষ্ক্রমণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে যখন গ্রামের নিকটে আসিতেছিলাম আমার গ্রন্থপাঠের সহিত বনের ছায়া, পাখীর গান এবং আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইতেছিল। অখণ্ড অবসর ছিল—এবং কল্পনাকে বাধা দিবার জন্য না ছিল জনতা, না ছিল অট্টালিকা, না ছিল অবরুদ্ধ রাজপথের ধূলিমিশ্রিত বিচিত্র কোলাহল।

ছবি অথবা কোন সুন্দর শিল্পদ্রব্য পাইলে মানুষ সেটিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ধরিয়া কিছু গ্রীবা হেলাইয়া দেখে—

চোখের উপরে যেখানে শত সহস্র জিনিষ ভিড় করিয়া আসিয়াছে সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রাখিয়া সেটিকে স্বতন্ত্র সমগ্রভাবে দেখিতে চাহে। সাহিত্যের সুন্দর জিনিষগুলিও তেমনি কিঞ্চিৎ দূরে ধরিয়া দেখিবার যোগ্য। নহিলে আমার মন এবং তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্পনাদূতীর ঘনঘন আনাগোনা করিবার পথ থাকে না।

এই জন্য মাঠের মধ্যে আমার রাজসিংহ পড়িবার বড় সুযোগ ঘটিয়াছিল। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে—কিন্তু আসল ব্যাপারটি বাঁধানো গ্রন্থের কালো মলাটের কারাপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত মাঠ এবং সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছিল। বঙ্কিম বাবু যেন এই দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মৃত্তিকাপটের উপর তাঁহার বইখানি ছাপাইয়া ঐ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের সোনার-জল-করা অনন্ত নীলাকাশের মলাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন।

কত দিনের ব্যবধান, কত দূরের কথা, এ মানুষেরাই বা কোথায়, এবং এই সকল ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল বেগগামী প্রবল ঘটনা-প্রবাহই বা আমরা ম্যুনিসিপালিটির পুরপালিত বঙ্গসন্তান কোন্ খানে দেখিতে পাইব! কোথায় বা সেই মোগলের বিলাসতরঙ্গিত দিল্লি, কোথায় বা সেই রাজপুতানার অনুর্ব্বর মরুভূমি ও দুর্গম গিরিমালা, যাহার কঠিন স্তনের বিরল স্তন্যরসে রাজপুত সিংহ-শাবকেরা নির্জ্জনে লালিত হইতেছিল! সুবিশাল প্রান্তর এবং অবারিত আকাশ নহিলে কি ঘনহর্ম্ম্যপীড়িত অবকাশবিহীন ট্রাম-রথচক্রমুখরিত কলিকাতায় এ সমস্ত কল্পনা-পট প্রসারিত ভাবে ধারণ করিবার স্থান আছে?

সেই জন্যই মনে করিতেছি সৌভাগ্যক্রমে রাজসিংহ গ্রন্থখানি কলিকাতায় প্রথম আমার হস্তগত হইবামাত্রই অপহৃত হইয়া

যায়। চৌরের উদ্দেশে গালি পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা পাছে আমার কোন নিকট আত্মীয় অথবা প্রিয় আত্মীয়ার গায়ে যাজে এই ভয়ে ধৈর্য্যরক্ষা পূর্ব্বক বিরত ছিলাম, আজ তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

কলিকাতায় অঙ্গচালনার অনবসর এবং আহার্য্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্যবশতঃ ক্ষুধামান্দ্য ঘটে এই জন্য পরিতৃপ্তির সহিত কোন খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা যায় না। কেবল শারীরিক নহে, সেখানে মানসিক অগ্নিরোগেরও বড় প্রাদুর্ভাব। এত খবর, এত কথা, এত বক্তৃতা মনের মধ্যে অবিরল বর্ষিত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ লইয়া স্থির শান্তভাবে কোন কথা পরিপাক করিবার অবসর এত অল্প, উদার কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে মানসিক অঙ্গচালনা করিবার উপলক্ষ্য এত দুর্লভ যে মনের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায়, ঝাল টক চাট্‌নি ভাল লাগে কিন্তু ভাল জিনিষের ভালরূপ রস-গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। পল্লিগ্রামের আকাশ এবং অবকাশের মধ্যে আসিলে ক্ষুধা সঞ্চয় হয়, প্রত্যেক জিনিষের পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় এবং ভুক্ত রস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বাস্থ্যস্ফূর্ত্তি সঞ্চার করে।

সেই জন্য মাঠের মধ্যে যখন রাজসিংহ পড়িলাম সমস্ত বইখানি এমন নিঃশেষ করিয়া উপভোগ করিতে পারিলাম। আমার মনে পড়িতে লাগিল, অল্প বয়সে যখন রবিবারে স্কুলের ছুটির দিন অন্তঃপুরের নির্জ্জন ছাদে বসিয়া কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছিলাম তখন কেমন লাগিয়াছিল—কোথাকার এক পথবিহীন বনচ্ছায়াঘন কল্পনা-লোক হইতে উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্যসমীরণ আসিয়া নগরবাসী বালকের বিস্মিত হৃদয়কে পুলকিত ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়িতে লাগিল, যখন মাসে মাসে বঙ্গদর্শনে খণ্ড খণ্ড করিয়া

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হইতেছিল তখন মাসে মাসে আনন্দের আগ্রহে অন্তঃকরণ কিরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। চারাগাছ যেরূপ প্রতি রাত্রি অবসানে নূতন ব্যগ্রতার সহিত সূর্য্যালোক পান করিতে থাকে, মাসান্তে বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত মুকুলিত অন্তরের প্রত্যেক উন্মুখ অগ্রভাগের দ্বারা আনন্দরশ্মি গ্রহণ করিতে থাকিতাম। তখন এত বই পড়ি নাই এবং সমালোচনা যাহা পড়িতাম তাহাও বঙ্গদর্শন হইতে। আজ তাহার ডবল বয়সে নির্জ্জনে রাজসিংহ পড়িয়া সাহিত্যের সহিত সেই আমার প্রথম কৈশোর প্রণয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল।

মনে করিলাম এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা কিছু লিখিয়া ফেলি। কিন্তু সমালোচনা লিখিতে হইবে মনে করিলেই ভয় হয়। একটা ত আগাগোড়া ফাঁদিয়া বসিতে হইবে—একটা ত নূতন কথার অবতারণা করিতে হইবে। গ্রন্থের মধ্য হইতে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার এবং পাঠকবর্গ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন।

রাজসিংহের মধ্যে সে প্রকারের অপরূপ রহস্য অবশ্যই কিছু আছে, তাহার সন্ধানের ভার আমি বিজ্ঞ সমালোচকদের উপর রাখিয়া দিলাম। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি আমার হৃদয়ে যে সাহিত্যরস-পিপাসা আছে এ গ্রন্থ পাঠে তাহার কতটা পরিতৃপ্তি হইল।

এক হিসাবে সে কাজটা সহজ, এক হিসাবে শক্তও বটে। আলোচ্য গ্রন্থের কোন এক অনালোকিত গোপন প্রান্ত হইতে কোন একটা তত্ত্বকথা যদি সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনা যায় তবে সেইটাকে অবলম্বন করিয়া সঙ্গত এবং অসঙ্গত অনেক কথা বলিয়া লওয়া সহজ হয়।

কিন্তু ভাল লাগিল এ কথাটা বড় শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেটাকে একটা রীতিমত প্রবন্ধাকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলা সকল সময়ে সুসাধ্য বোধ হয় না।

আবার, যখন ভাল লাগে, তখন, কেন ভাল লাগে, কেমন করিয়া ভাল লাগে তাহার চেতনা থাকে না—উচ্ছ্বসিত সংক্ষিপ্ত হর্ষধ্বনি ছাড়া মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হয় না। সমালোচনা করিতে হইলে সেই অচেতন আনন্দকে নিতান্তই খোঁচা দিয়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে হয়।

আমি নিজেকে জেরা করিয়া অবশেষে একটা নূতন উপমা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেইটা দিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। লিখিতে লিখিতে যদি আরো কিছু মনে পড়ে ত পরে বলিব।

সাহিত্যরণরঙ্গভূমে কোন মহারথী ভীমের মত গদাযুদ্ধ করেন, আবার কেহবা সব্যসাচী অর্জ্জুনের মত কোদণ্ডে ক্ষিপ্রহস্ত। কেহ বা প্রকাণ্ড ভার লইয়া পাঠকের মস্তকের উপর নিপাতিত করেন, কেহ বা মুহূর্ত্তের মধ্যে পুচ্ছবান্ অসংখ্য লঘু শরসমূহে উক্ত নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তির একেবারে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলেন।

সাহিত্য-কুরুক্ষেত্রে বঙ্কিম বাবু সেই মহাবীর অর্জ্জুন। তাঁহার বিহ্যদ্গামী শরজাল দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে—তাহারা অত্যন্ত লঘু, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব করে না।

রাজসিংহ প্রথম হইতে উল্টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয়, যে, কোন ঘটনা কোন পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কাল-ক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।

এই অনিবার্য্য অগ্রসর-গতি সঞ্চার করিবার জন্ম বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।

কোন ভীরু লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বড় বড় কৈফিয়ৎ বসিত। জবাবদিহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদসাহজাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহাই লইয়া দুঃসাহসিকা আতরওয়ালী দরিয়ার প্রগল্‌ভতা, চঞ্চলকুমারীর নিকট আগন পরামর্শ ও পাঞ্জাসমেত যোধপুরী বেগমের দূতীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট নৃত্যকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার পুরুষবেশী অশ্বারোহী সৈনিক সাজিবার সম্মতি গ্রহণ—এসমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে—কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু এক একটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া গেছেন যে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বঙ্কিম বাবু একে ত কোথাও কোনরূপ জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দ্দোষী পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মাণিকলাল যখন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্ম্মলকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বসিতে বলিল এবং নির্ম্মল যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মানিকলালের অনুরোধ রক্ষা করিল, তখন লেখক কোথায়

তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন—

"বোধ হয় কোর্টশিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিকা!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্‌!"

এই গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রের, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড় একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড় বড় সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্ব্বে যথেষ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মত এক নিমেষে মেঘাবরোধ ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোন প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে পূর্ব্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিম বাবু তাহা পূরাপূরি দেন নাই।

সেই জন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই দ্বিধাপরায়ণ।

মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড় বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্য্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয় ত ছোট কিন্তু তাহার নথীটা বড় বিপর্য্যয়। আজকালকার নভেলিষ্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এই জন্য উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মত পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এই জন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্ম্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তব জগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেষ্টর অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দ্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় ও স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভঙ্গীতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আব-

শুষ্ক হয় নাই। যেন রেলপথের মাঝে মাঝে এমন এক আধটা ব্রিজ্ আছে যাহা পুরা মজবুৎ বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু চালক তাহার উপর দিয়া এমন দ্রুত গাড়ি লইয়া চলে যে, ব্রিজ্ ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবসর পায় না।

এমন হইবার কারণও স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত ঘরকন্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশ্যক দ্রব্যের মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলৎশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপকরণের প্রাচুর্য্য এবং ভার-বাহুল্য শোভা পায়।

রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মত—ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহরচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোন কোন পাঠক এবং সম্ভবতঃ বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবু বড় একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাঁহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সঙ্কীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছিল—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী! তখন রহিয়া বসিয়া ইনিয়া বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জ্জিত সংক্ষিপ্ত সংহত।

সে বাসররাত্রের সুখশয্যার বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান অভিমান লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা,—কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া অসম্ভব-চিত্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিত্রিত পক্ষীখচিত শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষপ্রাচীর মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসিটিট্‌কারী পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই পুষ্পপ্রতিমা সুকুমার সুন্দর বালিকাটুকুর মধ্যে কি এক দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল সে আজ বাঁধমুক্ত বন্যার একটি গর্ব্বোদ্ধত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহালে সুন্দরী জেব্‌উন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে দিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট্‌-দুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়। দস্যু মাণিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিল,

গৃহপিঞ্জরের নির্ম্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গচপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল!

অর্দ্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহ্ন-কুলায়বাসী প্রণয়ের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষা-রোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন মিষ্ট মুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভাল হইত।—যখন এই সকল কথা ভাবিতে-ছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছুদূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—

ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জ্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষলিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজের, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেব্উন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটবড় অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দ্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাহাদের জীবন ইতিহাসের, তাহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেব্‌উন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোন অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবনকাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানব-জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় ত সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিম বাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে, সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেব্‌উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট্‌দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্ম্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার

মর্ম্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতা-শয্যার মত তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বর-মাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব্‌উন্নিসা সম্রাট্‌প্রাসা-দের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহা কোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড় একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্য্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আর এক দিকে সর্ব্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্য্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন তিনি এই ধূলিলুণ্ঠমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়-কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতি-হাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ বিষয়ে

গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তারিত করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেই জন্য মনক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটা অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। গ্রন্থ পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

রাজসিংহ উপন্যাসখানি সম্বন্ধে মোট কথাটা আমার যাহা মনে উদয় হইয়াছে আমি তাহাই এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিলাম। হয় ত খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সমস্ত দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সে ভাবে লেখা আরম্ভ করি নাই এবং সে নৈপুণ্যও আমার নাই, অতএব এইখানেই বিরত হইলাম।

কৃতজ্ঞতা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোবিন সাহেবের পর ডোনাল্‌ড সাহেব জেলার পাকা কালেক্টর হইয়া আসিলেন। দীনেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটে এবং তাঁহার মাতা ও পত্নী কুণ্ডলার বাটীতে। ম্যানেজার বাবুটী পরলোক গমন করায় পুরাতন নায়েব সিদ্ধেশ্বর রায় সম্প্রতি সে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা ও তদ্বিরে কাছারী ফের কুণ্ডলায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

অকালী সিংএর প্রত্যাগমনের পরদিন ম্যানেজার মোক্তার হরানন্দ তালুকদারের চিঠি পাইলেন। মোক্তার মহাশয় তাহাতে পূর্ব্বদিনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, অদ্যই কালেকটর সাহেব কুণ্ডলা যাত্রার আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু পেসকার মহাশয়ের সহায়তায় তিনি হাকিমের সে রায় ফিরাইয়াছেন। অতঃপর ডোনাল্‌ড সাহেবের কবে শুভাগমন হইবে, তালুকদারপ্রবর সে কথাটা তেমন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু কৃতোপকারের জন্য পেসকার যে পুরস্কারের যোগ্য তাহার ইঙ্গিত করিয়া যথাসময়ে সকল কথার এত্তালা দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সিদ্ধেশ্বর রায় নায়েবির খোলস ছাড়িয়া বরি নিজ নূতন পদগৌরবের উপযোগী কোন একটা কৃতিত্ব দেখাইবার দাঁও খুঁজিতেছিলেন, অতএব এই খবরটায় একটু একটু উদ্বিগ্ন হইলেও নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না।

সংসারে যাহাকে কাজের লোক বলে মৃত ম্যানেজার ঠিক্ তাহা ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্মভয় এবং চক্ষুলজ্জা নামক

ছুইটা উপসর্গ বিদ্যমান থাকায় দাবী সত্ত্বেও তিনি ছোট তরফের বিষয়টাকে দেনার দায়ে একেবারে জাহান্নমে দিতে চাহিতেন না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর রায় বছর ছয়েক ছোটতরফে মুহুরিগিরি করার পর বড় তরফের নায়েব হইয়াছিলেন, ম্যানেজার হওয়ায় সহজেই ভাবিলেন মনিব সাবালক হইয়া দেওয়ানীটে তাঁহাকেই দিবেন, অতএব নূতন নিমকের হালালি করিতে যদি পুরাতন নিমকে হারামি ঘটে তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইহার ছুই একটা উত্তেজক কারণও ঘটিয়াছিল। মুহুরী সিদ্ধেশ্বর ম্যানেজার সিদ্ধেশ্বর বাবু হইয়া আসার খবর উঠিলে অকালী সিং একদিন আহ্লাদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যায় বটে, কিন্তু সে সেই আগেকার ধরণে কখন "আপ্" এবং কখন "তোম" বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। কথায় কথায় ছোট তরফের সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া অকালী সিং যখন বলিল যে,তাহার বিশ্বাস প্রভুকন্যার তিনি সর্ব্বনাশ হইতে দিবেন না, সিদ্ধেশ্বর রায় তখন রাগে গরগর করিতেছিলেন।

কাজেই নূতন ম্যানেজারের আমল পড়িতে না পড়িতে ছোট তরফের প্রজারা শুনিল, অতঃপর তাহাদিগকে বড় তরফে খাজানা দিতে হইবে। মফঃস্বলের আমলা পাইক নগদীরা পর্য্যন্ত ক্রমে বড় তরফের টান টানিতে লাগিল। অকালী সিং মহালে গিয়া আর বড় আমল পায় না। সর্ব্বস্ব যায় দেখিয়া সে বুদ্ধি খরচ করিয়া কালেক্টর সাহেবের শরণ লইয়াছিল।

অতি বুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বর বুঝিলেন কালেক্টর সাহেব দেখিতে আসিতেছেন যে, ছোট তরফের অধিকারিণী নাবালিকা কি না? তাহাকে এখন সাবালিকা প্রমাণ করাইতে পারিলেই বড় তরফের ডিক্রীতে বিষয়গুলা সদ্যঃ সদ্যঃ নীলামে উঠিবে। অতএব রায় মহাশয় তাহার তদ্বিরে ব্রতী হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধেশ্বর রায় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হুজুরে হাজিরি দিলেন। বিষয় আশয় সংক্রান্ত সলা-পরামর্শের কথা উঠিলে হরিপ্রিয়ার মাথায় যেন বজ্রপাত হইত, কিন্তু কৌশলী সিদ্ধেশ্বর রায় কোন না কোন অছিলায় মাঝে মাঝে তাঁহাকে দরবারে বসিতে অভ্যস্ত করিতেছিলেন। অন্যান্য সময়ে বারবেলা এবং শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী পাঁচ দিনের সাধ্য সাধনার কম রায়জীর হাজিরি গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এবারে অনুরুদ্ধ হইয়া বিনোদা দাসী তাঁহাকে জানাইয়া দিল, অতিশয় জরুরি এবং গোপনীয় পরামর্শ আছে, না শুনিলে কোকন বাবুর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অগত্যা কর্ত্রী ঠাকুরাণী দরবারে বসিতে সম্মত হইলেন—পর্দ্দার আড়ালে বিনোদা দাসী তাঁর কাছে রহিল। বাহিরের লোকের ভিতর কেবল বিশ্বস্ত খানসামা হরা ম্যানেজার বাবুর সম্মুখে থাকিতে পাইল। পর্দ্দানশ্যবর্ত্তিনী কর্ত্রী দাসী বিনোদার জবানি যাহা বলাইতেছিলেন, "মা বুলতিছেন" ইতি ভূমিকা করিয়া সে তাহাই উক্ত করিতেছিল। তাহার কথার কোন অস্পষ্টতা না থাকিলেও অভ্যাসবশতঃ হরা খানসামা মুৎসুদ্দিআনা করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে টীকা টিপ্পনি করিতেছিল। ইহাতে ম্যানেজার মহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলেও তিনি ঘাড় নাড়িয়া হরার কথায় সায় দিতেছিলেন।

রায় মহাশয় কর্ত্রীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, ভরসা মনিব স্বচক্ষে দেখিয়া খুসী হইলে ভবিষ্যতে ইষ্টেটের দেওয়ানী তাঁরই হইতে পারে। কিন্তু পর্দ্দার কাপড়টা কিছু অতিরিক্ত মোটা বলিয়া কর্ত্রী তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না,

হয়াও প্রণাম জানাইল বটে কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষণ যোগ করিল না। বিনোদা বলিল "মা পুছ্‌তিছেন, রায়জীর শরীর ত ভাল আছে ?"

"ভালই আছে" বলিয়া সিদ্ধেশ্বর একেবারে কাজের কথায় গিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কেননা তাঁহার জানা ছিল, অতঃপর কর্ত্রী তাঁর পুত্রকলত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গাস্নান কি ব্রাহ্মণভোজনের প্রসঙ্গ তুলিলে কাজের কথা চাপা পড়িয়া যাইবে। রায় মহাশয় তাই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন যে, শরীর তাঁর ভালই আছে বটে কিন্তু মনটা ভাল নাই। এবং তার পর কর্ত্রীর প্রশ্নমতে মোক্তারের চিঠির মর্ম্ম বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া কর্ত্রী কিন্তু রায় মহাশয়ের মত বৈষয়িক উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন হইলেন না। সরিক ছোট তরফের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কালেক্টর সাহেবের আদেশে যেদিন তাঁর কোকনকে দারোগা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেদিন মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন "মৈত্র গোষ্ঠীর যা কিছু ইজ্জৎ আবরু ছিল, তা আর থাকে না দেখ্‌চি। কোকনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে যাহোক্ ব্যাটাছেলে তাতে ইজ্জতের উপর হাত পড়ে নি। ছোটতরফের কুকীকে যদি নিয়ে যায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হবে! তার না হয় মা বাপ নেই, কিন্তু আমরা ত এখনও বেঁচে আছি। রায়জী, টাকা খরচ করলে কি কালেক্টর সাহেবকে নিরস্ত করা যায় না ?"

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হালকা বুদ্ধিতে রায়জীর সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, কিন্তু একে মনিব, তায় কৌশল করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কাজেই মনের সে ভাব গোপন করিয়া উর্ণনাভের মত তিনি জাল বিস্তারে মন দিলেন।

"হজুরের দয়া মায়ার শরীর, সকলের মান ইজ্জতের দিকেই

বৃষ্টি। কিন্তু ছোট তরফের বাবু এ তরফকে এক চোটে পেলে দুচোটের অপেক্ষা রাখ্‌তেন না। আমি তখন ও তরফে কাজ করি, আমার আর কিছু জান্‌তে বাকী নেই। তা কালেক্টর সাহেব যা ইচ্ছে করুক, তাতে আমাদের কি বয়ে গেল? তবে এই সুযোগে আমি ভাব্‌চি কি যে, ছোট তরফের বিষয়গুলো কোকন বাবুর ক'রে দিই। মাঠাকুরাণীর এতে কি মত?"

বিষয় আশয়ের কথা শুনিয়া কিন্তু মাঠাকুরাণীর মাথা ঘুরিতে-ছিল, বিশেষ এ প্রহেলিকার ছন্দাংশও তাঁর বোধগম্য হয় নাই। ম্যানেজার আপন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া দুইবার তাহা পুনরুক্ত করিলেন। কাজেই কলের পুত্তলির মত কর্ত্রী বলিলেন, "যা ভাল বিবেচনা হয় করুন।"

সাহস পাইয়া রায়জী বলিয়া বসিলেন "কালেক্টর সাহেব আসবেন তদারক করতে যে ছোট তারফের কুকী নাবালিকা কি সাবালিকা? নাবালিকা প্রমাণ হলে বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাবে, তাহলে পাঁচ সাত বছরের ভেতর ডিক্রীর দেনা সব শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে তিনি সাবালিকা, ষোল বছরের কম বয়স নয়, তা হলে কালেক্টর সাহেব বিষয় আশয়ে হাত দেবেন না, দেনার দায়ে অনায়াসে আমরা সর্ব্বস্ব বেচে নিতে পারবো।"

এতক্ষণে হরিপ্রিয়া ম্যানেজারের কথা বুঝিলেন এবং আতঙ্কে জিহ্বা দংশন করিলেন। বিনোদা তাহা দেখিয়া আপনা হইতে বলিল "সে চেষ্টা পাওয়া হবে না রায়জী!"

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

কর্ত্রীর শিক্ষামতে বিনোদা বলিল "মা বল্‌তিছেন, পরের মন্দ কর্‌তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। আমার কোকনের যা আছে তাই খায় কে? অধর্ম্ম করে' বিষয় করলে কি ভোগ হয়

রায়জী? আজও ত চন্দ্র স্থর্য্যি উঠচে—সত্যিই কিছু ঘোর কলি এখনও আসে নি।”

সিদ্ধেশ্বর রায় এ কথার উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিলেন, “ছোট তরফের বিষয়টুকু যদি হাত করতে পারি, বছর দশেকের ভিতর লক্ষ টাকার মুনাফা হবে সে আর কি আশ্চর্য্য কথা! কিন্তু সে সবই নির্ভর করচে কর্ত্তামার একটা কথার ওপর। কালেক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বল্‌তে হবে যে কুকীর বয়স ষোলবছরের কম কিছুতে নয়। আর তাতে কোকন বাবুর বয়সও কিছু বেড়ে যাবে। এখনও তাঁর সাবালক হতে প্রায় পাঁচবছর বাকী। এ হিসাবে খুব কম হয় ত তিনটে বছর এগিয়ে আস্‌বে।”

হরিপ্রিয়া। তা আমি কখন বল্‌তে পার্‌বো না। আমার একটী ছাওয়াল, আর জন্মে কত পাপ করেছি তাই এত শাস্তি। তামা তুলসী নিয়ে মিছে বলে’ কোকার অকল্যাণ করব?

বিনোদা বলিল “মা তামা তুলসী তোমার হাতে দ্যায় ত আমি জানালা গলিয়ে ফেলে দেব। সে ভয় করোনা।”

হরা বলিল, “সত্যি সত্যি কিছু কালেক্টর সাহেব কত্তামাকে তামা তুলসী দিয়ে জিজ্ঞেস করবে না। তাও কি হয়? মা হলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “বিষয় আশয় করতে গেলে কল কৌশল ছাড়া গতি নেই। তামা তুলসী! হলেই বা! রূপো সোণা বেশী কি তামা বেশী! তার পর টাকা খরচ করে’ প্রায়শ্চিত্ত করলেই ত পাপক্ষয় হয়!”

কর্ত্রী ঠাকুরাণী কিছুতে মিছা বলিতে সম্মত হইলেন না। “আমার ছাওয়ালের অকল্যাণ হবে” বারবার এই কথাই বলিলেন।

কাজেই সিদ্ধেশ্বর পরামর্শ করিলেন, কালেক্টর সাহেব আসিলে

শরীর ভাল নয় বলিয়া কর্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। রায়জী উঠিবার সময় বিনোদাও হরাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়। কিন্তু বিনোদাদাসী যতক্ষণ না স্নানের ঘাটে ভগীর দেখা পাইয়া তাহার কানে কানে সকল কথা বলিয়াছিল, ততক্ষণ তার প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভগী দাসী কখন কাহারও কথায় থাকে না। কিন্তু বিনোদা তার দূরসম্পর্কের মাসতুতো বোন, সে দুটো একটা কথা মাঝে মাঝে তাহাকে না শুনাইয়া ছাড়িত না। অন্য কোন কথা শুনিলে ভগী হয় তখনই ভুলিয়া যাইত, নয় পরিপাক করিয়া ফেলিত, কিন্তু সুরবালার অমঙ্গলসূচক অমন একটা খবর জমাদারকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় না শুনাইয়া সে থাকিতে পারিল না। শুনিয়া অকালী সিং অনেকক্ষণ অগ্নিগর্ভ ভূধরের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দুনিয়াতে নেমকহারামির ততটা প্রাবল্য হওয়ায় সেদিন প্রাতঃকালে অকালী সিং সুর করিয়া রামায়ণ পড়ার নিত্যকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিল এবং বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার আরক্ত চক্ষু এবং কম্পিত গুম্ফ হইতে গৈরিক নিস্রববৎ যে সকল তপ্ত বাক্যবাণ নির্গত হইল, বাঙ্গালী শ্রোতারা তাহার ভিতর "শ্যালা" ও "শশুরা" ছাড়া আর বড় কিছু বুঝিতে পারিল না। সুরবালা তখন অনন্যমনে দোতালার ঘরে বসিয়া পুতুলগুলিকে কাপড় পরাইতেছিলেন। অকস্মাৎ জমাদারের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া দেউড়ীর দিকে যখন ছুটিয়া গেল, অকালী সিং তখন তাহার সে দিনকার অব্যক্তনামা শ্যালক

বা শ্বশুরকে নাগরাপেটা করিয়া তুরস্ত করিয়া দিবে এইরূপ "কসম" লইতেছিল। কিন্তু সুরোদিদিকে দেখিবামাত্র তাহার সব রাগ জল হইয়া গেল। সুরবালা বিস্ফারিতনেত্রে ভয়ে কৌতূহলে যখন জিজ্ঞাসা করিল "কাকে অত গাল দিচ্চ জমাদার?" জমাদার তখন হাসিয়া বলিল "দুনিয়ামে বড়াসব নেমকহারাম আছে দিদি!"

কিন্তু স্নানান্তে খড়ম পায়ে দিয়া দীর্ঘশিখা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অকালী সিং যখন "চৌকার" দিকে যাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, অত রাগ না করিয়া ম্যানেজার বাবুকে নিজে গিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া আসিলে ক্ষতি কি? সত্য সত্যই কি সংসার এত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে নিমকের খাতির একেবারে ভুলিয়া যাইবে? অতএব "রোটী বানাইতে বানাইতে" অকালী সিং মনস্থির করিল রাত্রে সিদ্ধেশ্বর রায়ের বাসায় গিয়া গোপনে তাঁহার সহিত মোলাকাৎ করিবে।

এদিকে রায়জী কর্ত্রীঠাকুরাণীকে বাগাইতে না পারিয়া সাক্ষীর যোগাড় দেখিতেছিলেন এবং জনকতক পেসাদার সাক্ষীকে শিখাইতে পড়াইতে সেদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাছারীর মন্ত্রণাগৃহে থাকিতে হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন ছোট তরফের জমাদার অকালী সিং তাঁহার অপেক্ষায় তাঁহার বৈঠকখানায় দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া একটা ছোট্ট রকমের সেলাম করিল বটে, কিন্তু এমন সেলাম তিনি ছোট তরফে থাকার সময়ও করিত। তাঁহার পদবৃদ্ধির অনুপাতে সেলামও যে দীর্ঘতায় বাড়িতে বাধ্য, অকালী সিংহের মোটা বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত না হওয়ায় রায় মহাশয় আজ তাহা ফিরাইয়া দিলেন না এবং নিজে শয্যায় উপবেশন করিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে অকালী সিং ছাড়া গৃহস্থিত আর সকল

জিনিসের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। অকালী সিং ইহাতে প্রথমতঃ ভাবিল যে, রায়জী বুঝি তাহাকে দেখিতে পান নাই, আর এত রাত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া অন্যমনস্ক হওয়াও মানুষের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। অতএব পূর্ব্ব আনুগত্য স্মরণ করিয়া অকালী সিং বাবুর বিছানার দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।

বাবু ইহাতে মহা গরম হইয়া উঠিলেন। অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "তুমিত দেখ্‌চি বড় বেয়াদব হে?"

অকালী সিং বুঝিল, সে মুহুরী সিদ্ধেশ্বর আর নাই। হাসিয়া বলিল "বাবু, আমি গঁওয়ার, লেখা পড়া জানিনে বেয়াদবি করে' থাকি মাফ্ করবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার আসা। একথা কি সত্য যে আপনি ছোট তরফের নিমক ভুলে তার অনিষ্ট চেষ্টা করচেন?"

সিদ্ধেশ্বর রায় একবার একটু দমিলেন বটে, কিন্তু ধমক চমক করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার ভরসায় বলিলেন "এমন বড়কথা বরকন্দাজের সঙ্গে হতে পারে না।"

অকালী সিং হাসিল। "বাবু মনে পড়ে কি দশ বছর আগে এই বরকন্দাজ কোসিস্ না করলে আপনার চাকরী থাকা ভার হত? মনিব গোসা করে' আপনাকে জবাব দিলে এই বরকন্দাজ অকালী সিং আপনাকে রক্ষা করেছিল!"

এ অপমান, ম্যানেজার বাবুর অসহনীয় হইয়া উঠিল। "কোই হ্যায় রে" বলিয়া তিনি একটা হাঁক দিলেন বটে, কিন্তু ততরাত্রে পেয়াদারা কেহ হাজির ছিল না। খানসামা তামাক সাজিতে গিয়াছিল। অপমানের তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া সিদ্ধেশ্বর রায় নিজের জুতা কুড়াইয়া লইয়া অকালী সিংহের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন অকালী সিং সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত

হইল এবং "নেমকহারামির ফলভোগ কর" বলিয়া রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র দেহটাকে অবলীলাক্রমে বৈঠকখানার অপর দিকে ছুড়িয়া ফেলিল।

অকালী সিং শূন্য হস্তে গিয়াছিল—লাঠিখানাও সঙ্গে লয় নাই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আর কেহ অগ্রসর হইল না দেখিয়া ধীরে ধীরে দেউড়ীতে ফিরিয়া চলিল।

এবার ফিরাও মোরে!

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি!—ওরে তুই ওঠ্ আজি!
আগুন লেগেছে কোথা? কার্ শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার! সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর

বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি' ;
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া ! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে ! এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে !—
কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান !
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার !—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে!
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন! বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে,
জনতার মাঝখানে! কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও!
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস!
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল!—যে দিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি!
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা!—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর

ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে!
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা!
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীতি—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত! দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,

সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বালায়েছে হোম-হুতাশন ;—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ! শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞ জনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা! তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে!—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি

আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক! তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে! তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে! প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল! লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে,
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা। হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা!

২৩ ফাল্গুন }
১৩০০ }

সাময়িক সারসংগ্রহ।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম।

"খৃষ্টধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মধ্যে কতটা ঐক্য আছে" এই বিষয়ে ম্যাক্সমূলর "নাইন্‌টীন্‌থ্ সেনচুরি" পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, "মুসলমানেরা কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাদিগের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "স্বাধীন অথচ পানদোষ বিবর্জ্জিত।" "যদি আমার তুর্কি বন্ধুদিগের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা তো বলেন, কোন মুসলমান স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হয় না।" যে ধর্ম্ম পানদোষ ও দুর্নীতি এই দুই বিষম রোগ আরাম করিতে পারে সে ধর্ম্ম আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন "অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষে সাধারণতঃ আমাদিগের স্বীকার করিতে হইল, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই উভয় ধর্ম্মের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ, পূর্ব্বে একটা বিবাদ ও মনান্তর না ঘটিলে এই উভয় ধর্ম্ম এক হইয়া যাইতে পারিত। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, কোরাণ-সম্মত তাঁহাদের ছয়টি প্রধান মত ও বিশ্বাস——ঈশ্বরের একত্ব, এঞ্জেলের অস্তিত্ব, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত পুস্তকের অস্তিত্ব, বিচারের দিন, এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট নিয়মাবলী——এইগুলি যদি মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মত ও বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের সহিত বিবাদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয়ান মাত্রেই এই প্রত্যেক মতগুলিতে সায় দিবেন সন্দেহ নাই। গোল বাধে যখন অনির্দ্দেশ্য বিষয়গুলিকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হয়।" মুসলমানের স্বর্গ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইরূপ বলেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মের মানবীকরণমূলক উপমাগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নহে; তা ছাড়া, স্বর্গের সুখ বর্ণনা করিতে হইলে পার্থিব সুখের অনুরূপে বর্ণনা না করিলে চলে না। অতএব পার্থিব সুখের চরম সুখ সেই যে স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্ব (যদি স্বর্গে স্ত্রী-

পুরুষভেদ থাকে) সেই বন্ধুত্বের সুখকে তবে কেন পরলোক হইতে বহিষ্কৃত করা হয়? যদি মহম্মদ রতন কাঞ্চন অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে উচ্চতর মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কেন দোষ দেওয়া হয়? লোকে মনে করে, যেন মহম্মদ স্বর্গের আর কোনও সুখের কথা জানিতেন না, তাই সুন্দরীদিগের অন্তঃপুর বলিয়া স্বর্গকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। অনেক স্থলে, যেখানে তিনি স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখমাত্র করেন নাই। আর যে যে স্থলে স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে, সেখানে স্ত্রীলোকেরা পত্নী বা বন্ধু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদি বা কোন কোন স্থলে পত্নী ছাড়া সুন্দরী কুমারীদিগের উল্লেখ থাকে তাতেই বা এত রাগ কেন? এ কথা সত্য ফিলজফরেরা পরলোকে যে সুখসম্ভোগে সম্মতি দেন, তাহার ন্যায় এই সুখের কল্পনাটি ততটা আধ্যাত্মিক নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যতই ছেলেমানুষি হোক্ না কেন, হুরিদের বর্ণনায় কোন প্রকার অশ্লীল অপবিত্র ভাব নাই।" বহুবিবাহ ও দাসত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক এইরূপ বলেন—"এমন অনেক সুশিক্ষিত মুসলমান আছেন যাঁহারা বহুবিবাহ ও দাসত্বপ্রথাকে ভাল বলেন না। বহুবিবাহ তো ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মহম্মদ বহুবিবাহের আদেশ দেন নাই, তবে ইহুদিরা এই প্রথাটি রহিত করিবার পক্ষে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল তিনিও সেইরূপ কেবল উপেক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। এই চিরস্মরণীয় কথাগুলি তিনি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন, "আমি মানুষ বৈ আর কিছুই নহি। আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন যাহা তোমাদিগকে আদেশ করি, সে আদেশ তোমরা গ্রহণ কর। এবং যখন আমি পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ করি, সে আদেশ তোমরা গ্রহণ কর। এবং যখন আমি পার্থিব

বিষয় সম্বন্ধে তোমাদিগকে আদেশ করি তখনও আমি মানুষের অধিক আর কিছুই নহি।”

অধ্যাপক তাঁহার তুর্কি বন্ধুদের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া দেখিয়াছেন “একটি বিষয় তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, খৃষ্ট যেমন আপনাতে মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন এমন আর কোন ধর্ম্ম-গুরু করিতে পারেন নাই।” তবে ম্যাক্স্ মূলর একথাও স্বীকার করেন যে, “মহম্মদ সত্য ও ন্যায়ের উদ্দেশে এবং লোকের হিতার্থে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যে সত্যের মধ্যেই ঈশ্বরের ভাব ধরিতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই বুঝা যাইতেছে তিনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মগুরু। তবে তিনি যে স্বীয় অন্তরাত্মার নীরব বাণীকে আর্কেঞ্জেল গেব্রিএলের বাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায়, যে, তাঁহার ভাষা আমরা বুঝি না।”

হিন্দু-বিজ্ঞান কিরূপে বিনষ্ট হইল?

গত জানুয়ারী মাসের “কলিকাতা রিভিউ” পত্রিকায় “বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-মনের সম্বন্ধ” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞান দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া গেল এবং তাহার সহিত কাল্পনিক উপন্যাস ও ঔপধর্ম্মিক বাতুলতা সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান অধোগতি প্রাপ্ত হইল। উন্নতির অবস্থায় দর্শনের যে সূক্ষ্মতা, পর্য্যবেক্ষণের যে যথাযথতা এবং যুক্তির যে তীক্ষ্ণতা দেখা গিয়াছিল তাহা একেবারেই তিরোহিত হইল। লেখক বলেন, সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনের অভ্যুদয়ই এই পতনের

প্রধান কারণ। বেদান্তদর্শনই এ দেশের ভৌতিক উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ—অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বেদান্তদর্শন পার্থিব পদার্থের প্রতি ঘোর ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়া বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিল। বেদান্ত বলিলেন, আত্মার অভ্যন্তরে মনোনিবেশ কর, অবাস্তব বাহ্ প্রকৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া আসল সত্যকে ভুলিয়ো না। নিরাধার মূল সত্যই যোগীর ধ্যানের বিষয়।

আর এক কথা, প্রকৃতি হিন্দুর প্রতি নিতান্ত সদয় হইয়াই নির্দ্দয় হইয়াছেন; তাঁহার অতিমাত্র স্নেহই হিন্দুকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর আবার এই বেদান্তের শিক্ষা। কেবল জীবনরক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক তাহা বিনাক্লেশে প্রকৃতির নিকট হইতে হিন্দুরা পাইয়াছে—তাহার উপর আবার বেদান্ত এই শিক্ষা দিতেছেন, জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত যাহা প্রয়োজনীয় তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাক, তাহার অধিক অর্জ্জন করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ও বৃথা কালহরণ মাত্র। শুধু তাহাই নহে, বেদান্ত আরও বলিলেন, আত্ম-ত্যাগ আত্ম-নির্য্যাতন অভ্যাস কর, জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন কর এবং সর্ব্বপ্রকার দৈহিক পার্থিব আরাম সম্ভোগে বীতরাগ হও। এই শিক্ষার পর বিজ্ঞানের উন্নতি আর কি করিয়া হইবে?

সাধারণ বিদ্যালয়ে কলাবিদ্যার শিক্ষা।

পার্ট্রিজ সাহেব "আরেনা" পত্রিকার জানুয়ারি মাসের সংখ্যায় "সত্য ও মিথ্যা শিক্ষাপ্রণালী" নামক একটি প্রবন্ধে এইরূপ বলেন, বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক শিক্ষার বিষয় হইতে চিত্রবিদ্যা সঙ্গীত

ব্যায়াম প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার কথা মনে করা দূরে থাকুক, বরং কি কি উপায়ে আরও প্রচুররূপে ও সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল বিষয় প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে তাহার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। লেখক বলেন, প্রত্যেক শিশুর অভ্যন্তরে প্রতিভা-স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করা উচিত। শিশুদিগের মানসিক বৃত্তিসমূহ ও তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের জীবনের উপর সমস্ত কবিতাময় প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত। কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতকে ধরা উচিত। শুধু সমস্বরে সকলে মিলিয়া গান করা নহে—উৎকৃষ্ট সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে শুনিতে হইবে। প্রচলিত কন্‌সার্টের স্বর শুনিয়া কোন উপকার নাই—উচ্চদরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। বিখ্যাত বেহালাবাদকেরা যখন নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তখন তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনাইয়া শিশুদিগকে শোনানো উচিত। যে ছেলেকে অতিশয় ম্যাদা বলিয়া মনে করিতেছ, হয়তো তাহার প্রতিভা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে এবং সেই হয়তো ভবিষ্যতে তৃষ্ণাতুর জগৎকে সঙ্গীতসুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবে। বড় বড় গুণী লোকদিগকে আসিতে বলিলেই তাঁহারা আসিবেন। গুণী লোকেরা মহানুভব লোক—রাশি রাশি অর্থ পাইলে তাঁহারা যত না সন্তুষ্ট হইবেন—শিশুদের মনোরঞ্জন করিবার অবসর পাইলে তাঁহারা তাহাতে অধিক তৃপ্তিলাভ করিবেন। ইহাতে শিশুদের কল্পনা যতটা উত্তেজিত হইতে পারে এমন আর কিছুতে না। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ভাল ভাল সমবেত-সঙ্গীত ও অপেরা শুনাইতে লইয়া যাওয়া উচিত। সুস্বর ও সুতানে তাহাদের কর্ণকে পূর্ণ কর।

তা ছাড়া, বিদ্যালয়ের ঘরের দেয়াল খালি রাখা কর্ত্তব্য নহে।

তাহাদের চখের সাম্‌নে কেতাব রাখা যতটা দরকার, পাঠশালার দেয়ালে বড় বড় চিত্রকরদের চিত্রের অনুকৃতি রাখাও তেমনি প্রয়োজনীয়।

এমন এক সময় আসিবে যখন পাঠ-গৃহে ছবি ও মূর্ত্তি রাখা বিদ্যালয়ের সাজসজ্জার একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া লোকে মনে করিবে।

ছেলেদিগের অন্তর সুমধুর সঙ্গীতে পূর্ণ কর, কবিদের উচ্চ চিন্তাসকল তাহাদিগকে শুনাও।

কিন্তু এই সকল বিষয় শিখাইবার জন্য উচ্চদরের শিক্ষক আবশ্যক।

এইরূপ ধরণের শিক্ষক আবশ্যক যাঁহারা সংকীর্ণমনা নহেন—যাঁহাদের মনের গতি সার্ব্বভৌমিক, যাঁহাদের সহানুভূতিক্ষেত্র সুবিস্তৃত এবং যাঁহাদের অন্তর দয়াদাক্ষিণ্যে পূর্ণ।

য়ুরোপের যুদ্ধসজ্জার ব্যয়।

চার্লস রবর্ট সাহেব "ইকনমিক রিভিউ" পত্রিকায় য়ুরোপীয় যুদ্ধসজ্জার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডে নৌ-যুদ্ধসজ্জার বৃদ্ধিসাধনের জন্য যে চীৎকার উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যুদ্ধসজ্জার প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডও য়ুরোপের সহিত যোগ দিতে বসিয়াছেন। অনিবার্য্য বেগে সেই দিকে ঝুঁকিতেছেন। কিন্তু ইহাতে যে দেশের কত ক্ষতি তাহা য়ুরোপের যুদ্ধসজ্জার ব্যয় হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

১৮৬৯ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯টি য়ুরোপীয় রাজ্যের (শান্তিরক্ষার জন্য) স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা ২,১৯৫,০০০

হইতে ৩,২৪০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে! ১৮৬৯ অব্দে ২০টি য়ুরোপীয় রাজ্যের ৬,৯৫৮,০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৮৯২ অব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এক কোটী পঁচিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজারে দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপে সৈন্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত যে আইন জারি হইয়াছে তাহা যখন কালসহকারে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে তখন য়ুরোপে স্থায়ী-সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২২,৬২১,৮০০ হইবে।

১৮৬৯ অব্দে ১৯ রাজ্যের যুদ্ধসজ্জার ব্যয়ের হিসাব ১১২,০০০,০০০ পৌণ্ড ধরা হইয়াছিল। ১৮৯২ অব্দে তাহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে—১৯৮,০০০,০০০ পৌণ্ড হইয়াছে। ঐ সকল লোকে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত থাকিলে গড়ে তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে বার্ষিক ৪০ পৌণ্ড অর্জ্জন করিত। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ য়ুরোপীয় যুদ্ধসজ্জায় ব্যয় ন্যূনকল্পে ৩২৮,৫০০,০০০ পৌণ্ড দাঁড়াইতেছে। গিফেন সাহেব বলেন, ফরাসী-জর্ম্মান যুদ্ধের সময় দশ মাসে যে খরচ হইয়াছিল, শান্তিকালে য়ুরোপে ২০ মাসে সেই খরচ হইতেছে। য়ুরোপের জাতীয় ঋণ এক্ষণে ৫০ কোটী পৌণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

অধ্যাপক টিণ্ড্যাল সম্বন্ধে হর্বর্ট্ স্পেন্সরের উক্তি।

"ফর্টনাইট্লি রিভিউ" পত্রিকায় হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার মৃত বন্ধু টিণ্ড্যালের যশ কীর্ত্তন করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে টিণ্ড্যা-লের কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলেন ; "এই গঠনকারিণী কল্পনা (স্মৃতিমূলক কল্পনার কথা এখানে বলিতেছি না) যাহা একদিকে কবির রচনায় এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে প্রকাশ পায়, এই কল্পনাশক্তি সমস্ত মানবীয় বৃত্তির মধ্যে উচ্চতম। অধ্যাপক টিণ্ড্যালের এই শক্তিটি প্রচুর পরিমাণে ছিল"। তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে

টিণ্ড্যালের কিরূপ মতামত ছিল তাহা স্পেন্সর একস্থলে এইরূপ বলেন। "মনোবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রের অনির্দ্দেশ্য সীমার মধ্যেও গিয়া পড়িয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায় কি না সন্দেহ—কারণ তত্ত্ববিদ্যা হইতে পরিণামে অজ্ঞেয়তা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সচরাচর বৈজ্ঞানিকেরা যাহা আদৌ বুঝে না, তিনি তবু এ কথা বুঝিতেন যে, প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ শেষ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে গেলে অতিভৌতিকে গিয়া উপনীত হইতে হয় এবং এমন একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যাহা পূরণ করা আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য। তিনি যে সকল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন ও লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এই কথাটি প্রমাণ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জ্ঞাত পদার্থ অজ্ঞাত পদার্থের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই অজ্ঞাত পদার্থ নাস্তি অপেক্ষা অধিক। বৈজ্ঞানিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক শ্রেণী যাঁহারা ফ্যারাডে প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ তফাৎ করিয়া রাখেন—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি আছে তাহা লইয়া তাঁহারা আপনাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করেন না। আর এক শ্রেণী যাঁহারা একমাত্র বিজ্ঞানের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন; তাঁহাদের কখনই মনে হয় না যে উহাদের অন্তর্নিহিত আর কোন তত্ত্ব থাকিতে পারে। এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মধ্যেই টিণ্ড্যাল ভুক্ত ছিলেন না। এই শেষ শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে যখন যাহা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাহার মধ্যে গূঢ় অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইত"।

রাজনীতির দ্বিধা।

"তেলা মাথায় তেল ঢালা" সংসারের নিয়ম আর রুক্ষ মাথায় তেল ঢালা চুলায় যাক্ দুই চার গুচ্ছ চুল উৎপাটন করিয়া আনিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি বোধ হয় না। যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে অন্যেরাও তাহাকে যত্নসহকারে রক্ষা করে, যে আপনাকে সাহায্য করিতে সক্ষম অন্যেরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার একটা কারণ এই পাওয়া যায়, যে, যাহার আছে তাহাকে কিছু দিলে সেও আমাকে কিছু দিতে পারে, যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে তাহার সহিত যোগ দিলে কালে সে আমাকেও রক্ষা করিতে পারে। আর কিছু না হৌক্, আমার অনিষ্ট না করিতেও পারে!

এই কারণে সাধারণতঃ ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড় বড় গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্ত্তি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্ত্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মত মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙ্গায় বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষী বিশেষ।

যেমন ব্যক্তিবিশেষ তেমনি সম্প্রদায়বিশেষ এবং জাতিবিশেষ সম্বন্ধেও খাটে। য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য যত সদয় যত ন্যায়পর বাহিরে ততটা নহে এ পর্য্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃষ্টানদের নিকট খৃষ্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহা-রাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃষ্টানের এক গালে চড় মারিয়া

তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃষ্টান যদি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্ততঃ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্প্‌খাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্য-ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবর্চ্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খৃষ্টান অ্যামেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অষ্ট্রে-লিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই আপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃষ্টানের গালে খৃষ্টানী চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খৃষ্টানের হাতে। ট্রুথ্ নামক বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারি-বেন সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চির-সঞ্চিত সভ্যনীতি, য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধ-নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মত খসিয়া পড়ে এবং

সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসঙ্কোচে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্ব্বর লবেঙ্গুলা ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন ইংরাজ-যে সে কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরাজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরাজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্ম্মনীতি আজ কাল বড় বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁৎখুঁৎ করিলে কাজ চলে না। ইংরাজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন সে নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। অসভ্যগুলাকে ঠেলা মারিয়া সরাইয়া দিয়া ইংরাজ যদি খানিকটা চরিয়া খাইবার জায়গা পায় তবে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। নর্ম্মাণ দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরাজ বংশধর ভিন্ন জাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্ব্বল রুগ্নপ্রকৃতি। কিসের মাটাবিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরাজ আমি তোমার সোনার খণি, তোমার গরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্যে এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন!

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত বুদ্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোট এবং দুর্ব্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্ত্তে মুখের মধ্যে পূরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন কি, হয়ত ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং যদি ধরা পড়ে ত কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোন দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোক্‌রাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি! কিন্তু স্বীকার করে না যে ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতনকালের চৌর্য্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্ব্বকালের সেই নির্লজ্জ অসঙ্কোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের উপর নিজের চেতনা জন্মিয়াছে সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্ব্বের মত তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও

খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইষ্ট্ খেলে, স্ত্রীসমাজে মধুরালাপ করে, কেহ সন্দেহ মাত্র করে না যে, এই শাদা কামিজ কালো কোর্ত্তার মধ্যে রবিন্ হুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট রুদ্রমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজমধ্যেই যে সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড় অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এসব কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্ব্বল নব শতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু সেণ্টিমেণ্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। এখানে সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারী এবং অসঙ্কোচ একাধিপত্য।

এই জন্য আমাদের কর্ত্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজ[illegible] দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর [illegible] প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্ব্বতা হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যখন দস্যু ব্লেক্ সমুদ্রদিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইভ ভারতভূমিতে ব্রিটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ৎ দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরাজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোন জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোন নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন, গুটি-কতক লোকও তাহার সদ্বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনি সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এই জন্য বিদেশে জকাল কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল এবং সেজন্য সে সর্ব্বদা অধৈর্য্য

আমরাও সেই জন্য ইংরাজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সে জন্য ইংরাজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গী যখন লুটপাট করিত, ঠগী যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কন্‌গ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়! কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোন ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মহারাষ্ট্রী এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্ম্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারো মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কন্‌গ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরাজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্ম্মের কাহিনী বলিলে যদিবা সে না মানে তবু তার একটা ধর্ম্মসঙ্গত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভাল জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্য বিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহারা যথার্থ পক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্ম্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নি ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সঙ্কট! জাতির পক্ষে নিজের জীবন রক্ষা এ[illegible] ধর্ম্ম রক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ [illegible] যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজেদের ধর্ম্মের আ[illegible] ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা [illegible]

তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রযত্নে বলবান্ না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশ-বৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে জীবনের আবশ্যকীয় উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্ মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এক্স্চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সে জন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসান আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়ারের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসান যাইতে পারে না। তৎপরিবর্ত্তে বরঞ্চ পব্লিক্ ওয়ার্কস্ কিছু খাট করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপর দিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতি কোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্ম্মনীতি এমন সঙ্কটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষী-সমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরাজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার যো নাই সেই সময়ে ধর্ম্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোন যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্ম্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক্ ধরিয়া যায়।

ভারত মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য ভাবে গতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরাজ রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায় অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেম্নি সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত মন্ত্রী-সভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস্ করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা—বিশেষতঃ কম্‌লির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দ্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন্ পাস্ করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার কৈফিয়ৎও তেমন সুবিধামত নাই। নবাবের মত বলিতে পারি না যে, আমার যে অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবারও অলংঘ্য বিঘ্ন—অথচ এই সঙ্কটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে!

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্ণমেণ্ট যদিবা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সঙ্কোচ বোধ করে, ছোট ছোট কর্ত্তারা কোন সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের বড় বড় খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ